ড. মোঃ ছানাউল্লাহ
পারিবারিক
শান্তি প্রতিষ্ঠায়
ইসলাম

পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ড. মোঃ ছানাউল্লাহ

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❖ বাংলাবাজার ❖ মগবাজার

www.amarboi.org

পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ড. মোঃ ছানাউল্লাহ্

ISBN : 978-984-8808-27-6

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২২১৯৫, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল
আগস্ট, ২০১১
শ্রাবণ, ১৪১৮
রমাযান, ১৪৩২

প্রচ্ছদ
শাহ্ ইফতেখার তারিক

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭২৬-৮৬৮২০২

মূল্য : ১৬০ টাকা

PARIBARIK SHANTI PROTISHTHI ISLAM (Islam in the establishment of family peace) written by Dr. Md. Sanaullah Published by Ahsan publication First Edition August-2011 Price **Tk. 160.00** only

AP-79

www.amarboi.org

রিভিউ অভিমত

ড. মোঃ ছানাউল্লাহ্ রচিত **"পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম"** শীর্ষক বইটি পড়ে দেখলাম। বইটির শিরোনামের সাথে বক্তব্যের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং তথ্য ও ভাষা বেশ ভাল। এটি সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়েছে।

আমার মতে বইটি প্রকাশ করা যেতে পারে।

(ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

মানবতার উচ্চাসনে মানুষকে সমাসীন করতে মহান আল্লাহর মহা অনুগ্রহ হচ্ছে ইসলামী জীবনব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার অসংখ্য দিকের একটি হচ্ছে পারিবারিক জীবন। এ বিষয়ে ড. মোঃ ছানাউল্লাহ রচিত **"পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম"** নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ জনগণের কাছে পৌঁছাতে পেরে মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ।

স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজন নিয়ে এক সাথে বসবাস করাকে ইসলামে পারিবারিক জীবনব্যবস্থা বলা হয়। তবে পরিবারের মূল উপাদান হলো স্বামী ও স্ত্রী। এ স্বামী-স্ত্রীই পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে অশান্ত ও নিরাপত্তাহীন পৃথিবীতে সবাই শান্তির সন্ধান করে ফিরছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রয়োজন পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা। অথচ বর্তমানে সামান্য কারণে বহু পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের অন্যতম কারণ। দৈনিক পত্রিকার পাতা খুললেই এ ধরনের খবরসহ নারী নির্যাতনের বহু দৃশ্য প্রতিদিন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আমার ভাল লেগেছে যে, বিজ্ঞ লেখক এ গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত কুরআন ও হাদীসের আলোকে তুলে ধরেছেন। আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সহায়তা করবে, ইনশাআল্লাহ। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মান-অভিমান ও ভুল বুঝাবুঝি হতেই পারে। ভুলে অনড় থাকা সমাধান নয়; বরং ভুলের সংশোধন একান্ত প্রয়োজন। নবীজী বলেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর সেরা ভুলকারী হলো সে, যে নিজে ভুল স্বীকার করে না।' (তিরমিযী)

বিজ্ঞ পাঠকের কাছে অনুরোধ রইল, এ গ্রন্থে মুদ্রণজনিত কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে তা আমাদেরকে জানানোর। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করবো।

এ গ্রন্থটি প্রকাশ ও প্রচারের সাথে যুক্ত সবার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে মহা পুরস্কার প্রত্যাশা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিয।

বিনীত

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

www.amarboi.org

গ্রন্থকারের কথা

একটি পরিবারের স্থায়িত্ব, সুখ-শান্তি ও সঠিক বিকাশ যে দু'জনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তারা হল পরিবারের মূল উপাদান স্বামী ও স্ত্রী। যে দু'জন নারী-পুরুষ মিলে নির্ধারিত নিয়মে আইনসম্মতভাবে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে তারা স্বতন্ত্র পরিবেশে বেড়ে ওঠা দু'টি সত্তা। বিয়ের কারণে তাদের কেউ অন্যজনের অস্তিত্বে বা মতামতে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় না, যাওয়া উচিতও নয়। তাদের উভয়েরই স্বতন্ত্র অবস্থান ও মতামত বিদ্যমান থাকে। এজন্য দরকার হয় পরস্পরের প্রতি যথাযথ আস্থা-বিশ্বাস ও সম্মান রেখে সমঝোতা ও ঐকমত্য তৈরি করার।

অন্যদিকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে উভয়েরই দায়-দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। একজন অন্যজনের কাছ থেকে চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টি যেন অন্তহীন হয়ে ওঠে। এসব দায়িত্ব-কর্তব্য শতভাগ পালন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ফলে কখনো কখনো মতের অমিল, সম্পদের অপর্যাপ্ততা বা আত্মসম্মানবোধ ও মর্যাদার কম-বেশি হওয়ার কারণে পরিবারে অশান্তি ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এছাড়া বিয়ের সুবাদে দু'টি পরিবারে আত্মীয়তার সম্পর্ক হওয়ায় উভয় পরিবারের চাওয়া-পাওয়াও এক্ষেত্রে কখনো কখনো বাড়তি চাপ তৈরি করে। সন্তানের বিষয়টিও কখনো কখনো বৈবাহিক জীবনে বড় ধরনের সংকট তৈরি করে। নবগঠিত পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার জন্য কখনো কখনো দম্পতির পিতা-মাতাকে প্রতিবন্ধক মনে করা হয়; যা কোনভাবেই সঠিক নয়। একান্নবর্তী পরিবারও কিছু সমস্যার কারণ হয়ে থাকে। কারণ যা-ই হোক না কেন দাম্পত্য কলহ বা বিরোধ একটি পারিবারকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ভাঙ্গন এমনকি খুন-খারাবী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

'পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম' গ্রন্থে এসব অশান্তির কারণ চিহ্নিত করে এর যৌক্তিক সমাধান মানবিকতা ও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁজবার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অহর্নিশ ঐক্য

www.amarboi.org

ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধি-বিধান যে কত প্রয়োজন তারও বর্ণনা রয়েছে এখানে। দাম্পত্য জীবনে স্বাভাবিকতা অব্যাহত রাখতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিজেদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে। তবে অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী গৃহীত স্ত্রী বা স্বামীর কাজটি সঠিক ও যথার্থ হচ্ছে কি-না তা নির্ধারণে গ্রন্থটি সহায়তা করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বিশেষ করে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক কারণে যেসব নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয় তাদের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে ও অত্যাচারী স্বামীকে সংযত ও মানবিক হতে গ্রন্থটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অবলম্বনে গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে বিধায় শান্তির পথ উন্মুক্ত হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আলো এসেছে এবং এমন কিতাব যা (হিদায়াতের দিক থেকে) অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত থাকে, আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে তাকে শান্তির পথসমূহ প্রদর্শন করেন। আর তিনি (আল্লাহ) নিজের নির্দেশে (অর্থাৎ নিজের নির্ধারিত আইনের মাধ্যমে) তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে (সফলতা ও সৌভাগ্যের) সরল-সঠিক পথে পৌছে দেন।' (আল-কুরআন, ৫ : ১৫-১৬) কাজেই নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা যথাযথ পালনের নিমিত্তে গ্রন্থটি পাঠের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুদীর্ঘ বৈবাহিক জীবনের খুঁটি-নাটি বিষয়গুলোর বর্ণনায় হয়তো আরো বিস্তারিত ও সূক্ষ্মধর্মী হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য গ্রন্থটির কলেবর সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে গঠনমূলক যে কোন সমালোচনা আমাকে অনুপ্রাণিত করবে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের জীবনে বিশেষ করে পরিবারে ও দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনুক, এ কামনায়-

বিনয়াবনত

ড. মোঃ ছানাউল্লাহ

www.amarboi.org

সূচিপত্র

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ভূমিকা

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে আদি প্রতিষ্ঠান সুবিন্যস্তভাবে অবিরাম অবদান রেখে চলেছে, এর নাম পরিবার। একই উৎস হতে বিস্তৃত নারী-পুরুষের সমাজ স্বীকৃত ও আইনসম্মত বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলার রীতি অনাদিকাল থেকেই সমাজে প্রচলন রয়েছে। মানবজাতির বিস্তৃতি ও বংশ বৃদ্ধির নিমিত্তে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে তথা নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুজগত ও প্রাণীজগতের সবই এ নিয়মে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে নিজ নিজ অস্তিত্ব, বিস্তৃতি ও বিকাশের জন্য তাদের অতিরিক্ত কোন নিয়ম মানতে হয় না বা নিয়ম মানার কোন এখতিয়ার তাদের নেই। তারা সবাই মহান আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ব্যতিক্রম। তার এখতিয়ার রয়েছে কোন কিছু করা বা না করার। সে তার সমগোত্রীয় কোন পুরুষ না নারীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়তে পারে বা একাকি চলারও ক্ষমতা রাখে। দাম্পত্য সম্পর্ক গড়াটা স্বাভাবিক এবং একাকি চলাটা ব্যতিক্রম। মানুষের স্বাভাবিক জীবন চলার পথকে অব্যাহত রাখতে, শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল করতে তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেহেতু তার কোন কিছু করা বা না করার এখতিয়ার রয়েছে, সেহেতু সে কোনটা করবে আর কোনটা করবে না, তা নিয়ন্ত্রণের জন্যই তাকে তা মানতে হয়। বিশেষ করে যেসব বিষয়ে তার দুর্বলতা রয়েছে যেমন নারীর প্রতি পুরুষ এবং পুরুষের প্রতি নারী খুবই দুর্বল। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। তাছাড়া কাম-ক্রোধ, মোহ-লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মসাৎ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হিংস্রতা ইত্যাদি বিষয়েও তাকে ইসলাম ও সমাজের নিয়ম মেনে চলতে হয়। কাজেই জীবন চলার পথে স্তরে স্তরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে তাকে নিয়মের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন গঠন ও এর সুষ্ঠুতা-যথার্থতা রক্ষা করে চলা এ নিয়মেরই একটি। এ গ্রন্থে বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধি-নিষেধের

www.amarboi.org

যথার্থতা, কার্যকারিতা ও আবেদন সম্পর্কে অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধির আলোচনা-পর্যালোচনায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি ও মহানবী (স.) এর জীবন পদ্ধতি নমুনা হিসেবে ও বিধান বর্ণনায় অধিক হারে উদ্ধৃত হবে। এর অর্থ নিজেকে বা পাঠককে পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া নয়। এর অর্থ এগুলোকে নিজের জীবনে ধারণ করা। চলনে, বলনে ও মননে তা বাস্তবায়ন করে এর সুফল আহরণ করা। নিজের ইচ্ছা ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে এর আদলে রূপায়িত করা। বিভ্রান্তির হাত থেকে নিজেকে, পরিবারকে ও সমাজকে রক্ষা করা। ইসলামের রীতি-নীতি সবই কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত আইন-বিধান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। মানুষের জীবনের যে কোন বিষয় তা ব্যক্তিগত, বৈবাহিক বা পারিবারিক তথা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমুদয় বিষয়ের শৃঙ্খলা ও ভাল-মন্দ জানতে তাকে কুরআন-সুন্নাহর প্রতিই দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে।

বৈবাহিক জীবনে একজন পুরুষ ও একজন নারীকে হাজারো সমস্যা মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হয়। সমস্যাগুলো চতুর্মুখী। বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করার পরিকল্পনা কাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অসংখ্য সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে পারে। শুরুতেই পছন্দ-অপছন্দের সমস্যা। কনের জন্য যোগ্য বর বা বরের জন্য উপযুক্ত কনে হল কি না, দু'য়ের চাওয়া-পাওয়ার মিল হল কি না, পিত্রালয়ে কনে যে আদরে ও পরিবেশে ছিল শ্বশুরালয়ে তার সে আদর ও পরিবেশ অব্যাহত থাকবে কি না, কনে শ্বশুর-শাশুড়ির মেজাজ বুঝে চলবে, না স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবে, না দেবর-ভাসুর ও ননদ-ননাসকে সামলাবে, কনেই কি সবাইকে আপন করে নিবে, নাকি তাকে স্বামী বা স্বামী পক্ষের সবাই সাদরে গ্রহণ করবে, এক্ষেত্রে কার দায়িত্ব বেশি, কার কম, তদুপরি যদি থাকে অভাব-অনটন, রুক্ষ মেজাজ, স্বেচ্ছাচারিতা, দুরাচার-দুর্ব্যবহার তবে সমস্যার যেন কোন অন্তই থাকে না। এসব অন্তহীন সমস্যার কোন কোন ক্ষেত্রে সমাধানের আইনি বা কিতাবী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার

www.amarboi.org

সমাধান থাকলেও তা অনেকের অজানা। যারা জানেন তারাও সুবিধামত মানেন, অসুবিধা হলে মানেন না। পারিবারিক ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে অপরিহার্য অনেক কিছুই মানা হয় না। আবার ফালতু কিছু নিয়ম-পদ্ধতিও মানতে বাধ্য করা হয়।

পারিবারিক বা বৈবাহিক জীবনের সমস্যাগুলোর ধরন-প্রকৃতি প্রায় একই রকম। যুগের পরিবর্তনে এখানে উপকরণ ভোগ-ব্যবহারের মাত্রায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নারী হিসেবে স্ত্রীর মধ্যে নারী প্রকৃতি ও পুরুষ হিসাবে স্বামীর মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি আবহমান কাল থেকে প্রায় একই রকম চলছে এবং চলতে থাকবে। প্রকৃতি যেন সমুদয় গুণ-বৈশিষ্ট্যকে ভাগ করে অর্ধেক নারীকে আর অর্ধেক পুরুষকে দিয়েছে। আর প্রত্যেকের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি করা হয়েছে পুরোটার। চাহিদা ও সামর্থ্যের মধ্যে যে ব্যবধান তা নারীর সান্নিধ্য ছাড়া পুরুষ আর পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়া নারীর পূরণ হতে পারে না। ফলে শূন্যতার জায়গাটি পূরণ করবার জন্যই মূলত নারীর জন্য পুরুষ এবং পুরুষের জন্য নারী অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

বিষয়টি শুধু জৈবিক নয়; বাস্তবিকও। খাদ্য গ্রহণের মত মৌলিক প্রয়োজন থেকে শুরু করে বিলাসী জীবনের প্রয়োজনীয় কাজের সবগুলো একজন নারী বা একজন পুরুষের পক্ষে ভালভাবে করা প্রায় অসম্ভব। এজন্য ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বলা হয়েছে, সামর্থ্যবান নারী-পুরুষ যেন জুটি বেধে নেয়। জুটি বাধলে একটি জীবন তরীর পূর্ণ অবয়ব তৈরি হয়। জুটি বাধার সমাজ স্বীকৃত ও ইসলাম সম্মত সাংবিধানিক নাম বিয়ে। যার যার ধর্ম মতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সমাজের সমর্থন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তা সম্পন্ন করতে হয়। অন্যান্য প্রাণী জগত থেকে মানুষের জীবন প্রণালীকে আলাদা ধারায় প্রবাহিত করা ও জীব জগতের মধ্যে নিজেকে সেরা প্রমাণিত করা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করাসহ নানাবিধ মানবীয় প্রয়োজনে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান মেনে দাম্পত্য জীবনের ভীত তৈরি করতে হয়। মহানবী (স.)-এর সময়ের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে আব্দুর রহমান ইবন মাইসারা বর্ণনা করেন,

www.amarboi.org

এক ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন পুরুষ একজন মহিলাকে বিয়ে করে এমতাবস্থায় যে, তারা কেউ কাউকে চিনত না। পুরুষ সেই মহিলার নাম-ঠিকানাও জানত না এবং মহিলাও পুরুষকে মোটেও চিনত না। তারপর একরাত যেতে না যেতেই এরা দু'জন এমন আপন হয়ে যায় যে, পুরুষের কাছে ঐ মহিলার চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কিছু হয় না এবং মহিলার কাছেও ঐ পুরুষের চেয়ে অধিক ভালবাসার আর কোন ব্যক্তি থাকে না (এর কারণটা কি?) তখন মহানবী (স.) বললেন, এটা আল্লাহ্‌র দান, আল্লাহ্‌ই এ দু'জনের মধ্যে এমন মিল সৃষ্টি করে দেন। এই বলে তিনি আল্লাহ্‌র বাণী, 'আর তিনিই তোমাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা-হৃদ্যতা ও অনুকম্পা সৃষ্টি করে দেন।'[১] তাদেরকে পড়ে শোনান।[২]

নারী বা পুরুষ একাকি চলতে চাওয়া তার প্রকৃতি বিরোধী চলতে চাওয়ার শামিল। কুর'আন মাজীদে একজন মানুষ সে নারী হোক বা পুরুষ তার চার পাশের অন্যান্য মানুষকে তার সাথে সম্পর্কিত করে পরিচিত করানো হয়েছে। অন্য সব মানুষের সাথে তার একটা বন্ধন রয়েছে বলে তাকে জানানো হয়েছে। একজন মানুষ অনায়েশে খাবার খেতে পারে যাদের ঘরে তারা হচ্ছে, তার বাবা, মা, ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, খালা, মামা অথবা তার বন্ধু-বান্ধব।[৩] এ তালিকায় খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, এর অর্ধেক নারী আর অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ। এ সম্পর্ক বা বন্ধন তার জন্মগত বা বংশগত। এ বন্ধন থেকে মুক্তির কোন সুযোগ নেই। এটি নিত্য, অবধারিত ও অনিবার্য।

আবার জাগতিক শৃঙ্খলা রক্ষায় মানুষের সম্পদের প্রয়োজন। পৃথিবীতে কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না। একজন মানুষের অনুপস্থিতিতে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ যারা পায়, তারা হচ্ছে, ছেলে, মেয়ে, বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী,

---

১. আল-কুর'আন, ৩০ ঃ ২১

২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ, *তোহফাতুল আরূস ওয়া নুযহাতুন নুফূস*, (দিল্লী : মাকতাবা এশা'আতুল ইসলাম, তা. বি.), পৃ. ১৮

৩. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৬১

www.amarboi.org

ভাই ও বোন।[৪] এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মানুষ যেমন জন্মগত বন্ধনের কারণে একে অন্যের সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে, তেমনি আত্মীয়তার বন্ধনও তাকে অন্যের সম্পদের মালিকানা লাভের হকদার করে। স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর বা স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে মূল করণটি হচ্ছে একটি সুদৃঢ় বন্ধন।

আবার মানুষকে যাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে সে নিজে, তার পরিবার-পরিজন,[৫] তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃ-মাতৃহীন শিশু, অসহায়-দরিদ্র, প্রতিবেশী, স্বামী-স্ত্রী-বন্ধু-বান্ধব, পথিক-মুসাফির এবং অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ।[৬] এতে বুঝা যাচ্ছে যে, একজন মানুষ একা চলতে পারে না। তার যেমন চার পাশের সবার প্রতি দায়বদ্ধতা আছে, তেমনি তার প্রতিও সমাজের দায়বদ্ধতা রয়েছে। পরিবারের দায়-ভার কাঁধে নেয়ার সাথে সাথে একজন পুরুষ বা নারীর দায়িত্ব পালন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। আর তা জীবন অবসান হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। একার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, দু'য়ে মিলে করলে নিশ্চয় তা আরও ভালভাবে করা যায়। তাই সমাজের একক বা মূল ইউনিট হচ্ছে পরিবার।

যে দু'জনে মিলে পরিবার গঠন করল, তাদের দু'জনের মধ্যে অধিকারের প্রশ্নে কারো কম বা বেশি নেই। উভয়েই সমান মর্যাদা ও দায়ভার বহন করবে। তবে কর্মবিভাজনের ক্ষেত্রে স্বামীকে পুরুষ হিসেবে আর্থিক ও বহিস্থ দায়ভার বহনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে এবং স্ত্রীকে নারী হিসেবে অভ্যন্তরীণ গৃহ ব্যবস্থাপনার দায়ভার বহন করতে বলা হয়েছে। কেউ তার দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে অবশ্যই তাকে সহযোগিতা করার জন্য অপরজন এগিয়ে আসবে এবং তাকে সম্ভব সব রকম সহযোগিতা করবে। উভয়েই উভয়কে মেনে রয়ে-সয়ে জীবন যাপন করবে। তবে তাদের মধ্যে

---

৪. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১২

৫. আল-কুর'আন, ৬৬ ঃ ৬

৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৫

www.amarboi.org

একজনকে পরিচালক হিসেবে থাকতে হবে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে স্বামীর কাঁধে এটি চাপিয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, এখানে স্ত্রীকে স্বামীর অধীন অর্থাৎ পরাধীন করে দেয়া হয়েছে; বরং এখানে একটি বন্ধনের অধীনে যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামীও। তারা কেউ কারোর অধীন নয় এবং পুরোপুরি স্বাধীনও নয়। কেউ শাসক আর কেউ শাসিত-এ নিয়মটি বৈবাহিক জীবনে অচল। স্বামীকে শাসন করার তথা প্রয়োজনে প্রহার করার অনুমতি দেয়া হলে স্বামীর প্রতি স্ত্রী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। আবার স্ত্রীর হাতে পরিবারের শতভাগ কর্তৃত্ব ন্যস্ত হলে সেখানে স্বামী তার স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হতে দেখা যায়। মহানবী (স.) এর সময়ের ঘটনা। তিনি স্ত্রীকে শাসন করতে-মারতে নিষেধ করেন। এ নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্ত্রীরা স্বামীদের ওপর খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে। স্বামীদের অধিকার নষ্ট করছে এবং তাদের সাথে অশোভন আচরণ করতে শুরু করেছে। অতঃপর মহানবী (স.) তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) প্রহারের-শাসনের অনুমতি দেন। এ অনুমতির ফলে কিছুদিন যেতে না যেতেই বহুসংখ্যক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পরিবারে আসা-যাওয়া শুরু করে এবং স্বামীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ দায়ের করে। অতঃপর মহানবী (স.) বললেন, মুহাম্মদ (স.) এর ঘরে এসে অনেক মহিলাই ঘুরাফেরা করছে। তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করছে। তোমরা খুব ভালভাবে মনে রেখ, যারা স্ত্রীদের সাথে এরূপ আচরণ করে তারা তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ নয়।[৭] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সাংবিধানিক আইন দ্বারা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বা বৈবাহিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণের চেয়ে নৈতিক উপদেশ এবং মূল্যবোধের ওপর ছেড়ে দেয়াই যেন শ্রেয়।

---

৭. আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশ'আস, *সুনান আবু দাউদ*, (কানপুর : আল-মাকতাবা আল-মাজীদি, ১৯২৮/১৩৪৬), খ. ২, পৃ, ২৯২

www.amarboi.org

দাম্পত্য জীবনে অবারিত শান্তি নিশ্চিত করতে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। এখানে কেউ বড় আর কেউ ছোট নয়; উভয়ের অবস্থান সমান্তরাল। একজন যদি গৃহ ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ত থাকেন তবে অন্যজন সংসারের সাথে সম্পর্কিত বহিস্থ ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বাধ্য হয়েই। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে যেহেতু দু'জনের স্ট্যাটাস সমান, সেহেতু কাজের আর্থিক মূল্যমানের দৃষ্টিকোণ থেকে তা দেখার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কাজের অর্থমূল্যের বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য নয়। পরিবারের ন্যায় একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সমুদয় কাজের কোন্‌টি ছোট আর কো্‌টি বড় তা বলা মুশকিল। তাই সংসারের বা পরিবারের প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন যিনি যে দায়িত্ব পালন করেন তখন ঐ দায়িত্বটিই গুরুত্বপূর্ণ।

তারা উভয়ে পরম বন্ধু-তার চেয়েও বেশি কিছু। একে অপরের পরিপূরক। দু'য়ে মিলে বহমান রাখছে একটি গতিময়তাকে অবিরাম। এমন দু'জনের মধ্যে গায়ের রং, বংশ গৌরব, শিক্ষা-দীক্ষা, পদবী, ডিগ্রি, অর্থ-বিত্ত সামাজিক প্রতিপত্তি কোন কিছুই উঁচু-নিচুর ব্যবধানের দেয়াল তৈরি করতে পারে না। কারণ দু'জন একই অঙ্গীকারে তথা ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সমমর্যাদার ভিত্তিতে একে অন্যের প্রতি সমাজ স্বীকৃত ও আইনত সকল প্রকার দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ। কাজেই একে অন্যের মতামতের গুরুত্ব দিয়ে বৈবাহিক জীবনে যত বেশি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে ততবেশি সার্থক হবে।

স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক ঐতিহ্য, খাওয়া, পরা, জীবন-যাপন স্টাইল, রুচি, গতি, চিন্তা ও মননে পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। মোটা দাগের পার্থক্য হচ্ছে বংশ মর্যাদা, সামাজিক প্রতিপত্তি, যোগ্যতা এবং একজন পুরুষ ও অন্যজন নারী। এ ব্যবধানগুলোর ওপর মানুষের কোন হাত নেই। এসব পার্থক্যের মূলে যে রহস্য বা দর্শন রয়েছে, তা হল একজন অন্যজনকে জানবার, বুঝবার, পরিচিত হবার ও মর্যাদা দেয়ার সুযোগ তৈরি করা। তাছাড়া একে অন্যের প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার দর্শনও রয়েছে এই ব্যবধানের পিছনে। পুরুষ হিসেবে স্বামীর এক স্তর বেশি থাকার বিষয়টিও এ জাতীয়। এ বাড়তি স্তর উভয়ের এডজাস্টম্যান্ট বা সমন্বয়ের প্রয়োজনে

—২

www.amarboi.org

যেন কাজে আসে। প্রাধান্য বা আধিপত্য বিস্তার এর উদ্দেশ্য নয়। বৈবাহিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এবং গতিশীল পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণে এ ব্যবধানের সুষ্ঠু চর্চা অপরিহার্য। সুতরাং যার যেখানে যতটুকু ঘাটতি ও অভাব রয়েছে, সেখানে বাড়তি, উদ্বৃত্ত ও সামর্থ্যবানকে তা পূরণ করে দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় করে নেয়ার মানসিকতা উভয়ের মধ্যে সবসময় সচল থাকতে হবে।

পরিবারের পরিচিতি

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল দর্শন হচ্ছে 'হায়াতে তায়্যিব'[৮] তথা পূত-পবিত্র, সমৃদ্ধ ন্যায়ানুগ, সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় জীবন। এ জীবনদর্শন বাস্তবায়নের প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার ও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা। পরিবার মানব সভ্যতার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। সৃষ্টির প্রথম থেকেই পরিবারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মানব সন্তানের জীবনের সূচনা হয় প্রথমত পরিবারেই। এখানে একজন মানুষের জীবন সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামগ্রিক জীবনের ভীত রচিত হয় এখানেই। এখান থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন। পারিবারিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা, সভ্যতা, ভদ্রতা, নিরাপত্তা ও একাগ্রতা সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ইসলাম পারিবারিক জীবন ব্যবস্থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল একক ও মৌলিক ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পরিবারের উপাদান প্রধানত দু'টি। এক, রক্তের বাঁধন; দুই, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। তাছাড়া দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ, বংশ বিস্তার, সন্তানের প্রতিপালন, আত্মরক্ষা, নিরাপত্তা, সঙ্গপ্রিয়তা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সমাজবদ্ধ জীবনের সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষকে পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। তাই পরিবার হচ্ছে একাধিক মানুষের একটি দল; যারা রক্ত কিংবা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ ও একত্রে বসবাস করে।

---

৮. আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ৯৭

www.amarboi.org

ইসলামী আইন ও বিধান অনুযায়ী পরিবার হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীকে নিয়ে গঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আবার একত্রে বসবাস করে এমন কতিপয় লোককেও পরিবার বলে, যারা পরস্পরে বৈবাহিক সূত্রে বা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়।[৯] কুরআন ও হাদীসে পরিবার বুঝাতে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে 'আহ্ল', 'আল' ও 'আয়াল'।[১০] অভিধানে এই তিনটির শব্দের অর্থে যা বলা হয়েছে তা হল, 'আহ্ল হচ্ছে স্ববংশীয় লোকজন-আত্মীয়বর্গ ও আপন স্ত্রী। 'আল' অর্থ হল পরিবার-পরিজন এবং 'আয়াল' শব্দটি 'আইয়্যেলু'র বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে-কোন ব্যক্তির ঘরের ঐ সব অধিবাসী, যাদের জিম্মাদারী-দায়িত্বভার ঐ ব্যক্তি বহন করেন।[১১] অর্থাৎ কারো পরিবার বলতে প্রধানত তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকেই বুঝানো হয়।

সুতরাং পরিবার বলতে এমন কতিপয় লোকের একত্রে বাস বা সম্মিলনকে বুঝায় যেখানে বৈবাহিক সূত্রে স্বামী-স্ত্রী এবং রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ সন্তান-সন্ততি, কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানাদির স্ত্রী-পরিজন ও পিতামাতা বসবাস করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا "তিনি তো আল্লাহ্, যিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বংশীয়-রক্ত সম্পর্কীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পর্কশীল করেছেন।"[১২] তিনি আরও বলেন- الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة - 'আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের

---

৯. Brass Professor and Director: Family Planing Health and Family welbing Population Research Institute New York, ১৯৯৬, P.২২৭.

১০. আল-কুর'আন, ৬৬ ঃ ৬, ১৫ ঃ ৫৮-৫৯, মহানবী (স.) বলেছেন, 'সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র পরিজন-আয়াল। আল্লাহ্‌র কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে তার পরিজনের প্রতি বেশী অনুগ্রহশীল।" (ইমাম বায়হাকী (রা.) শু'আবুল ঈমান অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (শেখ ওয়ালিয়্যুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, মিশকাতুল মাসীবাহ, (কলকাতা : এম. বশির হাসান এন্ড সন্স, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৪২৫

১১. ইবরাহীম আল-মাদকুর, *আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত*, দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, ১৯৭২/১৩৯২

১২. আল-কুর'আন, ২৫ ঃ ৫৪

www.amarboi.org

স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের থেকে তোমাদের সন্তানাদি ও নাতি-নাতনি সৃষ্টি করেছেন।'[১৩]

মুসলিম পরিবার গঠনের আর একটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে এই যে, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা মেনে চলা। পরিবারের কোন সদস্য ইসলামচ্যুত হলে, অমুসলিম হয়ে গেলে সে ঐ পরিবারের সদস্য বলে গণ্য হয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنى من اهلى و ان وعدك الحق وانت احكم الحكمين- قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح - -এবং নূহ্ (আঃ) তাঁর প্রভুকে ডেকে বললেন, হে প্রভু! আমার ছেলেতো আমার পরিবার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বিচারক। আল্লাহ্ বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয় সে দূরাচার।'[১৪] তিনি আরও বলেন- واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما – قال ومن ذريتى قال لا ينال عهد الظالمين – 'যখন ইবরাহিম (আ.) কে তাঁর প্রভু কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাব। তিনি (ইবরাহিম আ.) বললেন, আমার বংশধর থেকেও (নেতা বানাবেন)। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।'[১৫] কাজেই একই বিশ্বাস ও আদর্শের অনুসারী হওয়াও ইসলামে পারিবারিক বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার এক অন্যতম শর্ত।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীগণ নানাভাবে পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। ম্যালিনোস্কীর মতে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিসহ পরিবার নামক গোষ্ঠী, পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। কি বন্য, কি বর্বর, কি আদিম, বা সভ্য সব সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব ছিল ও আছে। তিনি বলেন, পরিবার

---

১৩. আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ৭২

১৪. আল-কুর'আন, ১১ ঃ ৪৫-৪৬

১৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১২৪

www.amarboi.org

সামাজিক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিককে সার্বিকভাবে প্রভাবিত করে।[১৬] M.F. Nimkolf Zuvi Marriage and the Family গ্রন্থে পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- "পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ, যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানাদিবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে। মেসিবারের ভাষায়- The Family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise enduring to provide for the procreation and upbringing of children . সামনার ও কিলার-এর মতে, 'পরিবার হলো ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কমপক্ষে দু'পুরুষ কাল পর্যন্ত তা স্থায়ী হতে পারে। এর সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকতে হবে।[১৭] বস্তুত, সমাজ স্বীকৃত রীতি অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে যখন একজন পুরুষ ও একজন নারী যৌথভাবে বসবাস করার অধিকার অর্জন করে, তখন একটি পরিবারের অস্তিত্ব লাভ করে।

পরিবারের যে রূপরেখা ইসলামে নির্ধারণ করা হয়েছে তা-ই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত, স্বাস্থ্যসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত ও স্নেহ-প্রীতি ভালবাসার বন্ধনের সাথে সর্বাধিক উপযোগী। এতে অণু পরিবারের প্রাইভেসি ও অধিকারসমূহের প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তেমনি প্রবীণ ও নবীন সদস্য যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, সন্তানাদি, নাতি-নাতনি প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের অধিকারের কথাও অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। মোটকথা, পরিবার হচ্ছে স্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান, এর সদস্যরা একই সাথে বসবাস করবে, একই খাবার গ্রহণ করবে এবং তাদের চিন্তা-চেতনা, মননে, ঐতিহ্যে ও আদর্শের মধ্যে ঐক্যসূত্র গ্রথিত হবে। এমন পরিবার এবং পারিবারিক বন্ধন আছে বলেই পৃথিবীর জীবন এত সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। এখানে সবাই বাঁচতে চায় অফুরন্ত আশা নিয়ে। উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হওয়ার পিছনেও মূল প্রেরণা এই পারিবারিক বন্ধন।

---

১৬. Malinowski, *Kinship in Encyclopaedia Britannica* London ১৯২৯

১৭. উদ্ধৃত, শাহ মুনিরুজ্জামান, মানব জীবনে ইসলাম, (ঢাকা : শাইখুল হিন্দ একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রী.), খ.২, পৃ. ২৪

www.amarboi.org

বর্তমান সমাজে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার প্রথা ও পারিবারিক বন্ধন দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ শৈথিল্য পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি করছে। যান্ত্রিক যুগসন্ধিক্ষণে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিচলিত মানুষের জীবনে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নতুন করে তোলে ধরা বিশেষ করে পারিবারিক মূল্যবোধকে অটুট রাখতে জনসাধারণকে সচেতন করা আজ সময়ের দাবী। পারিবারিক মূল্যবোধের পর্যায়ক্রমিক ধস আজ শুধু পশ্চিমা দেশসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্যাটেলাইট, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ও ফেসবুকের যৌথ মিশ্রণে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশেও নৈতিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। যৌথ পরিবারের ধারণাতো অনেক আগেই 'সেকেলে' হয়ে গেছে। এখন একক পরিবারের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন। বিশেষ করে পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কিংবা প্রাচ্যের জাপানের মত সমৃদ্ধ দেশে পরিবার ভাঙ্গার প্রবণতা এখন ব্যাপক; বিবাহ-বিচ্ছেদ পরবর্তী সমস্যা প্রকট। আবার কেউ কেউ পরিবারবিহীন উদাসীন জীবনকেই সুখের আধার হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

আধুনিক মানুষের জীবনে নানা কারণে পরিবারের ধারণা যেমন বদলাচ্ছে তেমনি আর্থ-সামাজিক কারণেও পরিবারের ধারণা প্রতি পদে পদে আহত হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতা, ভোগ স্পৃহা, দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা, প্রখর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, উড়নচণ্ডী মনোভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি মানুষকে ক্রমবর্ধমান হারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে বলে এই দুর্গতি। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, জনসংখ্যার আধিক্য এবং অধিক হারে নারীশ্রম ইত্যাদির কারণেও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়। কারণ যাই হোক, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার ও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা যে আজ হুমকির সম্মুখীন তা অস্বীকার করা যায় না।

www.amarboi.org

মূল্যবোধের অবক্ষয় উন্নত দেশের পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যা জর্জরিত করে ফেলছে। তাদের আজ ঘর থেকেও নেই, সংসার থেকেও নেই। তারা নিঃসঙ্গ ও একাকীত্বেও অসহনীয় জ্বালায় অস্থির। স্বামী সরে যাচ্ছে তার প্রিয়তমা স্ত্রী থেকে, স্ত্রী সরে পড়ছে তার আপত্য প্রেমের অনুসঙ্গ স্বামী থেকে। সন্তানাদি বঞ্চিত হচ্ছে পিতা-মাতার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ-প্রীতি ও মমতার বন্ধন থেকে। এ নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বেও সমাজ বিজ্ঞানীরা রীতিমত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। আজ তারাও শান্তিময় পারিবারিক জীবনে ফিরে আসতে চায় এবং এ জন্য নানাবিদ কর্মসূচীও গ্রহণ করছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৫মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালনের উদ্যোগে এরই প্রতিফলন ঘটেছে। মানুষের প্রয়োজনেই পরিবারের সৃষ্টি। মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল, সুন্দর ও নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই পরিবারের জন্ম। মানুষের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর বার্ধক্য সর্বাবস্থায় কোন না কোন প্রয়োজনে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। তার এ প্রয়োজন মিটানোর তাকীদেই তাকে একত্রে বসবাস করতে হয়। জন্মসূত্রে অথবা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবন যাপন করাই হচ্ছে পরিবার বা পারিবারিক জীবন। এ পরিবার যেভাবে একটি মানব শিশুকে বেড়ে ওঠতে সাহায্য করে, তেমনি তাকে যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেও বুঝা যায় যে, মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই পারিবারিক। বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, দাদা-দাদী, মামা-খালা ও নানা-নানীর অকৃত্রিম আদর-যত্নে একটি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। মানব শিশু জন্মের সাথে সাথে ওঠে দাঁড়াতে পারে না। মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের নিবিড় তত্ত্বাবধান ছাড়া তার বেঁচে থাকাই প্রায় অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقا من بعض خلق فى ظلمات ثلث 'তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে।'[১৮] তিনি বলেন,- و

১৮. আল-কুর'আন, ৩৯ ঃ ৬

www.amarboi.org

الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيأ وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।'[১৯] এ অসহায় শিশুর পরিচর্যায় পরিবারের আপনজনদের চেয়ে বেশি অবদান আর কেউ রাখতে পারে না। আবার প্রবীণত্বও মানুষকে কাবু করে ফেলে। রোগ-ব্যাধিতে বা বয়সের ভারে তখন সে নুয়ে পড়ে। দেশ-কাল অবস্থানভেদে সর্বস্তরের নারী-পুরুষের জীবনেই এটি ধ্রুব সত্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,- الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شيبة 'আল্লাহ্, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য'।[২০] তিনি আরও বলেন, ومنكم من يرد الى ارزل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيأ 'তোমাদের মধ্যে কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, ফলে যা কিছু সে জানত, সে সম্পর্কেও জ্ঞান থাকে না।'[২১]

বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে স্মৃতি বিভ্রাটে ভোগে। এমতাবস্থায় তার বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। এ কঠিন অবস্থায় সন্তানাদি ও পরিবারের লোকজনকে তার প্রতি যত্নবান হতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وبالوالدين احسانا- اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما- واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ربيانى صغيرا- 'আর পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ভাষায় কথা বল। তাদের জন্য দয়াপরবশ হয়ে

---

১৯. আল-কুর'আন, ১৬ : ৭৮

২০. আল-কুর'আন, ৩০ : ৫৪

২১. আল-কুর'আন, ১৬ : ৭০

www.amarboi.org

বিনয়ের বাহু প্রসারিত করে দাও এবং বল, হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা শৈশবে যেমন মায়া-মমতা দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন, তুমি তাদের প্রতি তেমনি সদয় হও।'[২২]

মানব জীবনের প্রতিটি স্তর তথা শৈশব-কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধকাল[২৩] সর্বাবস্থাই তাকে কারো না কারোর ওপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে শৈশব-কৈশোর ও বৃদ্ধকালে-এ নির্ভরশীলতা অনিবার্য। এ দু'টি সময়ে আপন পরিবারের চেয়ে নিরাপদ, আরামদায়ক ও উপকারী পৃথিবীতে আর কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নেই; হতে পারে না। যৌবনে মানুষ কিছুটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে থাকে। কিন্তু এ সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে নারীর জন্য পুরুষ আর পুরুষের জন্য নারী। এ সময়ে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ এবং পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠে। একে অন্যের সহযোগী হয়ে জীবন যাপন করতে চায়। এটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বভাবজাত প্রবণতা। এই প্রবণতার কারণেই মানুষ আবহমানকাল থেকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পুরুষ একজন নারীকে এবং নারী একজন পুরুষকে বরণ করার রীতি চলে আসছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। পরিবারকে পাশ কাটিয়ে আর যা-ই হোক স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায় না। উন্নত বিশ্বে বন্ধনহীন মুক্ত জীবনের নামে স্বেচ্ছাচারী হয়ে চলার যে রীতি তাকে সেসব দেশের বিশেষজ্ঞরাই 'ভয়ংকর' বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা স্থায়ী ও সংহত পরিবারের প্রশংসা করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। তাই বেশিরভাগ মানুষের জীবনে আজও পরিপাটি জীবনের প্রতিক হচ্ছে পরিবার।

পরিবার হচ্ছে মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল। সকল দুঃখ, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা

---

২২. আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ২৩-২৫

২৩. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,- ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا "অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে (মায়ের গর্ভ থেকে) বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও।" (আল-কুর'আন, ৪০ ঃ ৬৭)

www.amarboi.org

ও অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়াসে মানুষ শেষ পর্যন্ত পরিবারেই আশ্রয় খুঁজতে ফিরে আসে। কিন্তু সেই পরিবারেই যদি না থাকে শিশুদের প্রতি অনাবিল স্নেহ ও ভালবাসা, পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক, মাতৃস্নেহ, গৃহকর্তা-কর্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস, অহর্নিশ ভালবাসা, প্রবীণদের প্রতি কর্তব্যবোধ-শ্রদ্ধাশীল মনোভাব; তাহলে সৃষ্টির সেরাজীব হিসেবে মানুষের আর কি-ই-বা অবশিষ্ট থাকে। মানুষকে এ বিচ্ছিন্নতাবোধের হতাশা থেকে আজ হোক কিংবা কাল হোক একদিন না একদিন মুক্তি পেতেই হবে।

সমাজের মৌলিক একক হচ্ছে পরিবার। সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন পরিবারের সদস্যদের জন্যে যেমন সহায়ক তেমনি গোটা সমাজের জন্যেও প্রয়োজনীয়। সামাজিক শান্তি, সংহতি ও সমৃদ্ধিও কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পরিবার। সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবারই সামাজিকতা ও জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত করে।

সুন্দর দেশ গড়ার জন্য সুন্দর মানুষ প্রয়োজন। আর এ সুন্দর মানুষ তৈরির সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। শিশু জন্মের পর যে পারিবারিক পরিবেশে সে বড় হয়, সেখানেই তার ব্যক্তি মনন গড়ে ওঠে। একটি সুন্দর ও সুখী পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তি-মননও সুন্দর হয়ে থাকে এবং দেশ ও সমাজের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়। যুগে যুগে সুশীল সমাজের চাহিদা অনস্বীকার্য। সুশীল সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন সুমানুষ, সুনাগরিক। আর সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের কোন বিকল্প নেই। কুরআন মাজীদে পরিবারকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবন-যাপনকারী নারী পুরুষ ও ছেলে-মেয়েদেরকে বলা হয়েছে দুর্গের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। দুর্গ যেমন শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য, তার ভিতরে জীবনযাত্রা যেমন নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সর্বপ্রকারের আশংকামুক্ত; তেমনি পরিবারে নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরাও আইন ও নৈতিকতা বিরোধী পরিবেশ ও অসৎ-অশ্লীলতার আক্রমণ থেকে সর্বোতভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। পরিবারের নারী সদস্যদেরকে পবিত্র কুরআনে 'মুহসানাত' বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী বলেছেন- المرد بهن على المشهور زوات الازواج احصنهن التزوج

www.amarboi.org

او الازواج او الاولياء اى منعهن عن الوقوع فى الاثم. 'মুহসানাত' মানে স্বামীসম্পন্না মেয়ে লোক, বিয়ে কিংবা স্বামী অথবা অলী-অভিভাবক তাদের গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।'[২৪] বস্তুত পরিবারস্থ ছেলে-মেয়ের পক্ষে পিতামাতা, ভাই-বোনের তীব্র শাসন ও নিকটাত্মীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে পথভ্রষ্ট হওয়া বা ইসলাম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতি বিরোধী কোন কাজ করা খুব সহজ হতে পারে না। পারিবারিক জীবনের এই দুর্গের রক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য সর্বপ্রথম অপরিহার্য কর্তব্য।

নারীর অধিকার ও প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মূল ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। যে শিশুটি শৈশবে নিজের পরিবারে মা'কে সম্মানিত হতে দেখে, বোনকে আদর পেতে দেখে, বড় হয়ে সে নিজ স্ত্রীকে সম্মান করবে, কন্যাকে যত্ন করবে। যে পরিবারে নারীর সম্মান নেই সে পরিবারের শিশুও বড় হয়ে নারীকে সম্মান করতে শেখে না। পরিবারে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সামগ্রিকভাবে সমাজে তার অবস্থানের অবশ্যই উন্নতি ঘটবে।

পরিবারের সদস্যরাই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানব সভ্যতার উন্নয়নে কাজ করে এবং একইভাবে উন্নত সভ্যতার সব সুফল ভোগ করে থাকে। অর্থাৎ পরিবার, দেশ, জাতি ও মানব সভ্যতা একই চক্রে বাঁধা একটি বলয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর উন্নয়নশীল বিশ্বের সিংহভাগ মানুষের জীবনে পরিবার এখনও অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের ভাল হওয়া, মন্দ হওয়া, জীবনে মহৎ গুণাবলী অর্জন, সুশিক্ষা, চরিত্র গঠন, মনুষ্যত্ব অর্জন, আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা সবই নির্ভর করে মূলতঃ পরিবারের ওপর। প্রতি বছর ১৫মে সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালিত হয়। পরিবার প্রথার সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কম-বেশি সব দেশই আগ্রহী। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ

---

২৪. শাহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী (র.), *তাফসীর রুহুল মা'আনী*, (বাইরুত : দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসসুল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী.), খ. ৫, পৃ. ১

www.amarboi.org

১-২, অনুচ্ছেদ-১৬ (ক) (খ) (গ) এবং ২৫ অনুচ্ছেদে পরিবারকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৩ (ক) ধারা মতে প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে বলে পরিবার সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান সংযোজিত রয়েছে।

বস্তুত সত্যিকারের পারিবারিক স্নেহ-প্রীতির বন্ধন মানুষকে শৃঙ্খলিত করে না। এই বন্ধন মানুষকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিশীলিত জীবন যাপনে উৎসাহী করে তোলে, মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বাঁচতে সাহায্য করে। সবার আগে পরিবারই মানুষকে কর্তব্য সচেতন ও দায়িত্বশীল মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়। ইসলাম পরিবারের যে কাঠামো নির্ধারণ করেছে তা-ই হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল। এতে অণু পরিবারের প্রাইভেসি ও অধিকারসমূহের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, সন্তানাদি, নাতি-নাতনি প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের অধিকারের কথাও অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পরিবারের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে একদল সমাজবিজ্ঞানী ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্থান-কাল ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের অস্তিত্ব, ধরন-প্রকৃতি, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাদের মতে প্রাচীন কালে বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠনের কোন অস্তিত্বই ছিল না। মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাদের জীবন যাপন পশুদের মতই অবাধ ছিল। ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ ও যৌনতৃপ্তি লাভ ছিল তৎকালীন যুগের মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। বিয়ে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। বরং গোটা পুরুষ সমাজের জন্য গোটা নারী সমাজ একমাত্র ভোগের সামগ্রী বলে বিবেচিত হত। পরবর্তীতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা শক্তি বাড়তে

www.amarboi.org

থাকে এবং ধীরে ধীরে সভ্যতা ও সামাজিকতার দিকে অগ্রসর হয়ে নারী-পুরুষের মাঝে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ও সংরক্ষণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব যেহেতু প্রাকৃতিকভাবেই নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই পুরুষদের কাছে তারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেকালে সন্তান পিতার পরিবর্তে মা'র নামে পরিচিত হত। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন টিকেনি। নারীদের স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা তাদেরকে স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দখল করে নেয় এবং দখলী সম্পত্তির উপযোগী আইন কানুন তাদের ওপরে চাপিয়ে দেয়।

কিন্তু সমাজ যখন ক্রমবিবর্তনের ধারায় আরও কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে তখন পরিবার ও গোত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আইন-কানুনেও পরিবর্তন আসে এবং পরিবার একটি মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ইতিহাস সর্বাংশে সঠিক ও নিখুঁত নয়। কারণ, সমাজ বিজ্ঞানীগণ এসব ইতিহাস যতদূর সম্ভব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাকী সবটুকুই আনুমানিক ধরে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়েছেন।

অপরদিকে আরেক দল সমাজ বিজ্ঞানী পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করেছেন সম্পূর্ণ ওহী'র ওপর ভিত্তি করে। এতে মানব সৃষ্টি ও সমাজ সভ্যতার ইতিহাস যেমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশের বিষয়টিও ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস যাকে আদিম ও সূচনা বলে ধরে নিয়েছে এবং যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর, তাই ক্রমবিবর্তনের ফল, তাকে কোন মনুষ্যত্ববোধহীন কোন এক স্তরের ব্যাপার বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তাই যে একমাত্র সূচনা ও আদি, তা বলা যায় না।[২৫]

কুরআন ও হাদীসের বহু বাণীতে প্রথম পরিবার ও যুগে যুগে একই ধারায় পরিবারের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আদি পিতা আদম ও আদি মাতা

---

২৫. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ৪৮

www.amarboi.org

হাওয়া এর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপনের মাধ্যমেই প্রথম পরিবারের সূচনা হয়েছিল। এই প্রথম পরিবারের সদস্যদ্বয়কে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছিলেন, يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة--- 'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।'[২৬] আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত আদম ও হাওয়া জান্নাত থেকে পৃথিবীতে এসেও পূর্ববৎ পারিবারিক জীবন অব্যাহত রাখেন। এ দু'জনের ঔরস থেকে বিস্তৃত হয় মানব বংশ সারা দুনিয়ায়।[২৭] স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দৈহিক মিলনের ফলশ্রুতিতে সন্তান জন্মের মাধ্যমে মানব বংশ পৃথিবীতে গতিশীল রাখার ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই করে দিয়েছেন।[২৮] মূলত, ইসলামের প্রথম পরিবার ছিল যেমন সর্বোতভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার তেমনি তাতে ছিল পরিপূর্ণ শান্তি ও অনাবিল আনন্দ। পরবর্তীকালে আদম-হাওয়ার বংশধরদের মধ্যেও এ পারিবারিক জীবন পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নসবনামা বা বংশ তালিকা প্রথম মানুষ হযরত আদম আ. পর্যন্ত সহীহ্ হাদীসে ও ইতিহাস গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। নসবনামাটি হচ্ছে, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব, ইব্ন হিশাম, ইব্ন আবদে মান্নাফ, ইব্ন কোছাই, ইব্ন কিলাব, ইব্ন মুররা, ইব্ন কা'ব, ইব্ন লুওয়ায়ী, ইব্ন গালিব, ইব্ন ফেহের, ইব্ন মালেক, ইব্ন নজর, ইব্ন কেনানা, ইব্ন খুযায়মা, ইব্ন মুদরিকা, ইব্ন ইলিয়াস, ইব্ন মুজের, ইব্ন নেযার, ইব্ন মায়া'দ, ইব্ন আদনান।[২৯] এরপর থেকে হযরত আদম আ. পর্যন্ত নসবনামার বিবরণ রয়েছে সীরাত গ্রন্থসমূহে।

আর তা হচ্ছে, আদনান ইবন উদ, বিন উদূদ, বিন আল ঈসাত, বিন হুমিসা, বিন সালমান, বিন নাবিত, বিন হমল, বিন মুঈদ, বিন আদনান,

---

২৬. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৩৫

২৭. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১

২৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (আদমের) বংশধরকে সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।' (আল-কুর'আন, ৩২ ঃ ৮)

২৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, *সহীহ আল-বুখারী*, (দেওবন্দ : মাকতাবা আল-মুস্তাফাই, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৫৪৩

www.amarboi.org

বিন অদূদ, বিন হামিসা, বিন সলমান, বিন আউস, বিন বরু, বিন মুতাসাবিল বিন আবিল আওয়াম, বিন নাসিল, বিন হেররা, বিন ইয়াল দারুম, বিন বদলান, বিন কালেহ, বিন কাসিম, বিন মাখুর, বিন মাহী, বিন আসফী, বিন আনক, বিন ওবাইদ, বিন আলরুয়া, বিন হুমরান, বিন ইয়াসিন, বিন হারী, বিন বলখী, বিন ওরওয়া, বিন আনাফা, বিন হাসান, বিন ঈসা, বিন আফদাদ, বিন ঈহাম, বিন মুয়াসীর, বিন নাজিব, বিন রোজাহ, বিন সমঈ, বিন মুররাহ, বিন উস, বিন আওয়াম, বিন কাইজার, বিন ইসমাঈল (আ.), বিন ইবরাহীম (আ.), বিন তারিখ (আযর), বিন নাহুর, বিন সারুজ, বিন রাউ, বিন ফালিস, বিন আইবর, বিন সালিহ, বিন আরফাখশাখ, বিন খাম, বিন নূহ (আ.), বিন লখম, বিন মাতুশালাখ, বিন ইদ্রিস (আ.), বিন ইয়ার্দ, বিন মাহলিল, বিন ফাইনান, বিন ইউনুস (আ.), বিন শীষ (আ.), বিন আদম (আ.)।[৩০] এখানে দু'টি নামের মাঝখানে 'বিন' শব্দটি দু'জনের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নির্দেশ করছে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হয় না। এতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরিবারের উৎস জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির ফল নয়; বরং মানবতার সবচেয়ে আদি ও মূল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। এতে আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, পৃথিবীতে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল, যারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে এসেছিলেন, তাদের সবাই (ঈসা (আ.) ছাড়া) পারিবারিক জীবন যাপন করেছেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ছিল।[৩১]

পরিবারের এ সুষ্ঠু ধারা মানব সমাজের সব স্তরের সব শাখায় অব্যাহত ছিল, তা বলা যায় না। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কোন কোন স্তরে

---

৩০. ইবন ইসহাক, সিরাত-ই-রাসূলুল্লাহ, উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আজীজুর রহমান নু'মানী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ, ১১

৩১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। (আল-কুর'আন, ১৩ ঃ ৩৮)

www.amarboi.org

মানবজাতির কোন কোন শাখা পতনের ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত হয়েছে এবং সেখানকার মানুষ নানা দিক দিয়ে নিতান্ত পশুর ন্যায় জীবন কাটিয়েছে বলেও জানা যায়। ওহী'র বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে পার্থিব জীবনকে উশৃঙ্খল ও শয়তানী ভোগ-বিলাসে ভাসিয়ে দিয়ে পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য ও একমাত্র জীবন মনে করে পশু বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। তখন সব রকমের ন্যায়-নীতি ও মানবিক আদর্শকে যেমন পরিহার করা হয়েছে, তেমনি পরিত্যাগ করেছে পারিবারিক বন্ধনকেও। যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই যেন নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অবস্থা ছিল সাময়িক। বর্তমানেও এ অবস্থা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। এরূপ পরিস্থিতিকে বড়জোর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। গোটা মানবজাতির ইতিহাস তা হতে পারে না; বরং তা হল ইতিহাসের বিকৃতি। মানবতার বিজয়দৃপ্ত অগ্রগতির নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় নগণ্য ব্যতিক্রম মাত্র।[৩২] পরিবার গঠনের সঠিক নীতিমালা ও ধারা বজায় রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত আদম পুত্র অত্যাচারী কাবিলের হাতে খুন হতে হয়েছিল তার ভাই হাবিলকে।[৩৩]

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বেও দুনিয়া জুড়ে বিশেষ করে আরব সমাজে বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের কোন সুনির্ধারিত নিয়ম-নীতি ছিল না। আপন মা বোনদের মত বিবাহ নিষিদ্ধ নারীদের সাথেও তারা অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকে দোষ মনে করত না। একজন নারী একাধিক স্বামী গ্রহণ করত। পুরুষও যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত। অন্যের স্ত্রী-কন্যাদের ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদেরকে যৌন নির্যাতন করাকেও বাহাদুরির কাজ মনে করত। ব্যভিচার পরিবার ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, স্বামীর অনুমতি নিয়ে স্ত্রী পুত্র-সন্তান লাভের আশায় অবৈধ মিলনে লিপ্ত হওয়া স্বীকৃত ছিল। হাদীসের বর্ণনায় প্রাক-ইসলামী আরবদের মধ্যে চার প্রকার বিয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

---

৩২. আল-কুর'আন, ১৩ ঃ ৩৯

৩৩. আল-কুর'আন, ৫ ঃ ২৭-২৮

www.amarboi.org

এক. কোন পুরুষ কোন মহিলাকে মহর প্রদান করে বিয়ে করত। দুই. কোন পুরুষ মহৎ-আদর্শ পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্ত্রীকে কাঙ্ক্ষিত পুরুষের শয্যাশায়িনী হতে প্রেরণ করত এবং কিছুদিন তার সঙ্গ হতে দূরে সরে থাকত। অতঃপর সেই স্ত্রীর সন্তান ধারণের লক্ষণাদি প্রকাশ পেলে সে তাকে নিয়ে পুনরায় সংসার ধর্ম পালন করত। এ ধরনের বিয়েকে 'নিকাহ আল ইসতেবযা' বলা হত। তিন, দশ এর কম সংখ্যক কোন পুরুষ দল কোন একজন মহিলার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। এর ফলে উক্ত মহিলা সন্তান ধারণ করলে সে তার সন্তানের পিতা হিসেবে উক্ত পুরুষদের মধ্যে যার পরিচয় দাবী করত, সেই পুরুষ সে দাবী অস্বীকার করতে পারত না। চার. একজন মহিলার কাছে অনির্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষ আসা-যাওয়া করত। এতে কোন নারী মাতৃত্ব লাভ করলে উক্ত সন্তানের পিতা স্থির করার জন্য আকৃতির বিশারদদের ডাকা হত। যেসব পুরুষ উক্ত নারীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল তারাও সেখানে উপস্থিত থাকত। আকৃতি বিশারদগণ শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকৃতি পরীক্ষা করে উক্ত শিশু যার ঔরসজাত বলে স্থির করে দিত সে তা অস্বীকার করতে পারত না। মহানবী (স.) সত্য ধর্ম ইসলাম নিয়ে আবির্ভূত হবার পর তিনি জাহিলী যুগের সব ধরনের বিয়ে বাতিল করে মুসলিম সমাজে বর্তমানে প্রচলিত বিয়েকেই অব্যাহত রাখেন।[৩৪]

এছাড়া জাহিলিয়্যাহ যুগে এক ব্যক্তি দুই সহোদর বোনকে একই সাথে বিয়ে করতে পারত। মুত'আ (খণ্ডকালীন) বিয়েরও প্রচলন ছিল। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, মুত'আ হচ্ছে অস্থায়ী বিয়ে। পুরুষ মেয়েটিকে বলবে, আমি তোমাকে অর্থের বিনিময়ে কিছুদিন ভোগ করব। মুত'আ অর্থ ভোগের আনন্দ। এর মুখ্য উদ্দেশ্য যৌন সম্ভোগ; সন্তান জন্ম দান বা সংসার-ধর্ম পালন নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই খণ্ডকালীন বিয়ের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) খায়বার বিজয়ের দিন মতান্তরে মক্কা বিজয়ের দিন মুত'আ

---

৩৪. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬৯, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, অনু : আখতার ফারুক, রশিদ বুক হাউস, খ. ২, পৃ. ১২৮, ক. Wall, *Mahammad at Medina*, (Oxford, ১৯৬২), P. ৩৭৮-৭৯

—৩

www.amarboi.org

বিয়েকে চিরদিনের জন্য হারাম ঘোষণা করেন।[৩৫] শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এর প্রচলন রয়েছে বলে জানা যায়। জাহিলিয়্যাহ যুগে বৈবাহিক চুক্তি ছাড়া প্রেমিক-প্রেমিকা স্বামী-স্ত্রীর মত একত্রে বাস করতে পারত। জানাজানি হলে সামাজিক কারণে এ সম্পর্কের ইতি ঘটত।[৩৬] বিনিময়ের মাধ্যমে বিয়ে 'নিকাহ আশ্‌শিগার' এর প্রচলন ছিল। একজন বিবাহিত পুরুষ তার নিজের স্ত্রী বা কন্যাকে অপর ব্যক্তির স্ত্রী বা কন্যার মাধ্যমে বিনিময় করে বিয়ে করতে পারত। এতে কোন মোহরানা দিতে হত না।[৩৭]

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিয়েরও প্রচলন ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে তার উত্তরাধিকারদের কাছে অর্পণ করা হত। সমপরিমাণ মোহরানার বিনিময়ে উত্তরাধিকারীদের কেউ তাকে বিয়ে করত অথবা বেশী মোহরানার বিনিময়ে অন্যের কাছে বিয়ে দিয়ে মোহরানার অর্থ নিজে রেখে দিত; অথবা সারা জীবন এসব বিধবাকে নির্যাতিত জীবন কাটাতে হত।[৩৮]

'নিকাহ-উল-মিক্‌ত' বা ঘৃণিত বিয়ে। এই ব্যবস্থায় আরবরা পিতার মৃত্যুর পর সৎপুত্ররা সৎমাদের ভাগ করে নিয়ে বিয়ে করতে পারত। এতে কোন মোহরানার প্রয়োজন হত না। 'নিকাহ মুওয়াক্কাত' বা সাময়িক বিয়ে। নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন নারীকে বিয়ে করার রীতিকেই নিকাহ মুওয়াক্কাত বা সাময়িক বিয়ে বলা হয়। তৎকালীন সময়ে ক্রীত দাস-দাসীর প্রচলন ছিল। সম্পদশালী ব্যক্তি বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও ক্রীত দাসীর সাথে মিলিত হত। অবশ্য এ প্রথা ইসলামে রহিত করা হয়নি। স্ত্রীর ন্যায় ক্রীত দাসীর সাথে মিলনকেও বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে জাহিলিয়্যাহ যুগে দাসীদের দিয়ে পতিতা বৃত্তি করিয়ে মালিকরা সম্পদ আহরণ করত, তা হারাম করা হয়েছে।[৩৯]

---

৩৫. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৩ এবং সহীহ্ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬৬

৩৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৫ ও ৫ ঃ ৫ এর অনুবাদ ও তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩৭. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬৬, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম , (দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়া, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৪৫৪,

৩৮. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩৯.আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩৩

www.amarboi.org

বিয়েতে মহর প্রদানের প্রচলন ছিল। তবে মহরের সম্পদ স্ত্রী না পেয়ে পেত তার পিতা বা অভিভাবকগণ। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তির কোন অংশ তারা পেত না । ঐ সময়ে বিয়ের তেমন কোন সুনির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি ছিল না, বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক প্রদানের কোন মানবীয় নিয়ম ছিল না । ফলে স্ত্রীদের অনেক সময় দুর্ভোগ পোহাতে হত। ঈলা, খুলা, যিহার প্রভৃতি পদ্ধতিতে তারা স্ত্রীকে তালাক দিত। এতে আইনগতভাবে তারা তালাক প্রাপ্তাও হত না আবার স্বামীর সঙ্গে সংসার করার ক্ষমতাও তাদের থাকত না।[৪০]

পারিবারিক ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাহ যুগের এসব কুসংস্কার ও ত্রুটিপূর্ণ নিয়ম-পদ্ধতির সংশোধন করে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে ইসলাম সভ্য ও আদর্শ পরিবারের উপযোগী বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করে এবং পরিবার ও পরিবারের সদস্যগণকে সুসংগঠিত করে মার্জিত ও পবিত্র জীবনে ফিরিয়ে আনে।

ইসলামের পারিবারিক বিধি-বিধানসমূহের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

মহান আল্লাহ্ মানব জাতির সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যেসব নিয়ম-নীতি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং মানুষকে তা অনুসরণ করতে ও মেনে চলতে বলেছেন, তাই হচ্ছে ইসলামী বিধি-বিধান। এসব বিধানে মহান আল্লাহ্ মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। যখনই মানুষ আল্লাহ্র দেয়া বিধান ভুলে গিয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ত, তখনই তিনি তাদের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাঁর সেই চিরন্তন বিধান স্মরণ করিয়ে দিতেন।[৪১] আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে মহান আল্লাহ্ যেসব বিধান পাঠিয়েছেন, সেগুলো

---

৪০. Smith W. R. *Kinship and marriage in early Arabia*, (Cambridge, 1903), P. 92

৪১. আল-কুর'আন, ১৩ ঃ ০৭

www.amarboi.org

যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলের কাছে প্রেরিত বিধানের পূর্ণাঙ্গরূপ।[৪২] এ বিধানগুলো পৃথিবীতে আগত-অনাগত সব মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) গোটা সৃষ্টিজগতের জন্য শান্তির বাণী নিয়েই প্রেরিত হয়েছিলেন।[৪৩] জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেসব আইন বিধান মেনে কিভাবে জীবন যাপন করবে মহানবী (স.) নিজের জীবনে তা যথার্থরূপে বাস্তবায়ন করে মানুষকে তা হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন।[৪৪] বস্তুত, আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্ (স.) প্রদর্শিত বিধি-বিধানকেই ইসলামী বিধি-বিধান বলা হয়।

পারিবারিক জীবনে মানুষ এসব বিধি-বিধান অনুসরণ করলে ও মেনে চললে তাদের জীবন সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শান্তিময় হবে। কোন দুঃখ-কষ্ট তাদের স্পর্শ করবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'যারা আমার হেদায়েত বাণী তথা ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণ করবে, তাদের ওপর না কোন ভয় আসবে আর না তারা কোন চিন্তাগ্রস্ত হবে।"[৪৫] তিনি আরও বলেন, 'যে আমার হেদায়েত-বিধি-বিধান অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।'[৪৬] বস্তুত মহান আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব-খিলাফত ও দাসত্ব-ইবাদাত করা এবং পরিবারসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কর্তৃক প্রেরিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রবর্তিত সঠিক ও নির্ভুল নিখুঁত বিবরণ সম্বলিত যে হেদায়েত-পথনির্দেশ রয়েছে, তাই হচ্ছে ইসলামের পারিবারিক বিধি-বিধান। এ বিধানসমূহের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন,

১. এসব বিধি-বিধানের মূল উৎস হচ্ছে ওহী তথা পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ

---

৪২. আল-কুর'আন, ৪২ ঃ ১৩

৪৩. আল-কুর'আন, ২১ ঃ ১০৭

৪৪. আল-কুর'আন, ০৩ ঃ ১৬৪

৪৫. আল-কুর'আন, ০২ ঃ ৩৮

৪৬. আল-কুর'আন, ২০ ঃ ১৩২

www.amarboi.org

প্রামাণিক হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআন পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ,[৪৭] যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ফেরেশতা জিবরাঈল-এব মাধ্যমে লাভ করেন।[৪৮] পবিত্র কুর'আন যে আল্লাহ্‌র কালাম এতে কোন সন্দেহ নেই। এতে দ্বিমত পোষণের সব পথ রুদ্ধ করে যুক্তিপূর্ণ পন্থায় অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিনি বহু আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা যা দেখ এবং যা দেখ না আমি (সবকিছুর) শপথ করছি, নিশ্চয় এ কুর'আন এক সম্মানিত দূতের (জিবরাঈলের) আনীত এবং এটা কবির কবিতা বা কথা নয়, তোমরা কমই বিশ্বাস কর এবং এটা কোন গণকের কথা নয়, তোমরা কমই অনুধাবন কর; বরং এটা (কুরআন মাজীদ) বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত বা বানিয়ে বলত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম (কঠোর হস্তে দমন করাতাম) অতপর কেটে দিতাম তার ওয়াতীন[৪৯]-গ্রীবা। তখন তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না।'[৫০] 'আল-কুরআন যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বা রচিত হত, তবে এতে অবশ্যই তারা বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।'[৫১] কাজেই পারিবারিক জীবনে কুরআনে বর্ণিত বিধানসমূহই যে চূড়ান্ত -পূর্ণাঙ্গ তাতে দ্বিমত করার কোন উপায় নেই।

২. ওহীর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। এটি পরোক্ষ ওহী বা ওহী গায়রে মাতলূ। পবিত্র কুরআনের বাস্তব নমুনা বা আদর্শ হচ্ছেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.)। তাঁর জীবন- চরিত, সুন্নাহ্ বা হাদীস হচ্ছে ইসলামের জীবন্তরূপ। কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হচ্ছে সুন্নাহ্ বা হাদীস।

---

৪৭. আল-কুর'আন, ৪৫ ঃ ০২, ৪৬ ঃ ০২

৪৮. আল-কুর'আন, ২৭ ঃ ০৬, ২৬ ঃ ১৯২-১৯৫, ৫৩ ঃ ২-৫, ১৯ ঃ ৬৪

৪৯. 'ওয়াতীন' হচ্ছে, হৃদয় থেকে রির্গত সেই শিরা, যার মাধ্যমে আত্মা মানব দেহের বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

৫০. আল-কুর'আন, ৬৯ ঃ ৩৮-৪৭

৫১. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৮২

www.amarboi.org

এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, 'আর আমি আপনার প্রতি যিক্র-উপদেশ তথা কুরআন নাযিল করেছি, যেন আপনি তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা বর্ণনা করেন- ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'[৫২] বস্তুত পবিত্র কুর'আনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মহানবী (স.) যা কিছু বলেছেন এবং নিজে পালন করে দেখিয়েছেন তাই হচ্ছে হাদীস ও সুন্নাহ। কাজেই কুর'আন ও সুন্নাহ্ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর রাসূল (স.) তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক।'[৫৩] এ জন্যই মহানবী (স.) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এর প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব-কুর'আন মাজীদ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।'[৫৪]

এই ওহীর বিধানসমূহ সত্য-সঠিক এবং কোনরূপ মিথ্যা ও ভ্রান্তি তাতে নেই। সকল প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি ও সংশয়-সন্দেহ থেকে এসব বিধান সম্পূর্ণ মুক্ত।[৫৫] 'নিশ্চয় এটি (কুর'আন) নিশ্চিত সত্য।'[৫৬] নিশ্চয় কুর'আন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা এবং এটি উপহাস নয়।'[৫৭] মহানবী (স.) কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বাস্তব সত্য সেটাই, যা তোমার আল্লাহ্ বলেন। কাজেই তুমি সন্দিহান হয়ো না।'[৫৮] অন্য আয়াতে আছে, 'যা তোমার পালনকর্তা বলেন, তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না।'[৫৯]

---

৫২. আল-কুর'আন, ১৬ : ৪৪

৫৩. আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭

৫৪. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১

৫৫. আল-কুর'আন, ২ : ২

৫৬. আল-কুর'আন, ৬৯ : ৫১

৫৭. আল-কুর'আন, ৮৬ : ১৩-১৪

৫৮. আল-কুর'আন, ২ : ১৪৭

৫৯. আল-কুর'আন, ৩ : ৬০

www.amarboi.org

'হে নবী! আপনি বলুন, সত্য এসেছে; মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।'[৬০] 'হে নবী ! আপনি জিজ্ঞেস করুন, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মধ্যে যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? বলুন, আল্লাহ্ই সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।'[৬১] 'আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি যথার্থ সত্য আর আল্লাহ্র চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?'[৬২] 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।'[৬৩] 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন; এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহ্র চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হতে পারে।'[৬৪] সুতরাং আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণীতে বর্ণিত ঘটনাবলী, অবস্থাসমূহ, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎকাজের জন্য শাস্তির বর্ণনা ইত্যাদি সবই সত্য ও নির্ভুল। আল্লাহ্ বলেন, 'আপনার রবের কালাম সত্যতায় পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।'[৬৫]

৩. এ বিধানসমূহ মানবজাতি তথা সব সৃষ্টির জন্য প্রবর্তিত এবং তাদের সকল প্রয়োজন ও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানই এর লক্ষ্য। এ বিধানসমূহ মানুষের কল্যাণ সাধন এবং ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য মোচনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর দ্বারা মানুষের জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সহজতর করাই উদ্দেশ্য। এর প্রতিটি নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। রোযার বিধানের উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি (রমযান) পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায়

---

৬০. আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ৮১

৬১. আল-কুর'আন, ১০ ঃ ৩৫

৬২. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১২২

৬৩. আল-কুর'আন, ৩১ ঃ ৩৩

৬৪. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৮৭

৬৫. আল-কুর'আন, ৬ ঃ ১১৫

www.amarboi.org

থাকবে, সে অন্যদিনে গণনা পূর্ণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।'[৬৬] বিয়ে ও পরিবার গঠনের সাথে সম্পর্কিত বিধানসমূহ বর্ণনার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সবকিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথে তোমাদের পথ দেখাতে চান এবং তোমাদের প্রতি ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞ। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান; আর যারা কামনা-বাসনার অনুসারী তারা চায়, তোমরা সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। আর মানুষকে তো দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৬৭] মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও তীর নিক্ষেপে ভাগ্য গণনার মত নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ ইসলামী বিধানে হারাম করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, পারস্পরিক শত্রুতা, তিক্ততা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?'[৬৮] সুতরাং এ বিধানসমূহ একদিকে যেমন সমস্ত বিপর্যয় প্রতিরোধ করে তেমনি সমস্ত কল্যাণকে সক্রিয় করে তোলে। সমগ্র মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনই এর চরম লক্ষ্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ , দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষই এ বিধান থেকে কল্যাণ লাভে সক্ষম।[৬৯]

৪. এ বিধানসমূহ অপরিবর্তনীয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত।[৭০] এই আইন-বিধানের কোন কিছু কমানো যাবে না, বাড়ানোও যাবে না। যা ছিল তাই আছে এবং শেষ পর্যন্ত তাই থাকবে। 'এতে বাতিল বা মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটবে না,

---

৬৬. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৮৫

৬৭. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৬-২৮

৬৮. আল-কুর'আন, ৫ ঃ ৯১

৬৯. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আল- হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম*, (বাইরুত : দারুল কুরআনিল কারীম, ১৯৭৮/১৩৯৮)

৭০. আল-কুর'আন, ৯ ঃ ৩৬

www.amarboi.org

সামনের দিক থেকেও নয়, পেছনের দিক থেকেও নয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হবে না। এ বিধান প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।'[৭১] আর আল্লাহ্র কালিমাত-বিধানসমূহ পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই।[৭২] কারণ, এ বিধানসমূহের প্রবক্তা স্বয়ং আল্লাহ্ই তা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, 'অবশ্যই আমি এ যিক্র-কুর'আন নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণকারী'[৭৩] অন্য আয়াতে মহানবী (স.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে নবী! তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ ও তা পড়িয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব।'[৭৪] সুতরাং ইসলামের পারিবারিক বিধানে কোন রকম রদবদল করার কোন সুযোগ নেই। যার প্রতি এ কুর'আন নাযিল হয়েছে, তিনিও তাতে কোন পরিবর্তন করতে পারতেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,'হে নবী! আপনি বলুন, আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে এ কুর'আন পরিবর্তন করার কেউ নই।[৭৫]

৫. এ বিধানসমূহ অলঙ্ঘনীয়। কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ইতস্তত ছাড়াই এ বিধান ও পথ-নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং এগুলোর আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক, যদিও এগুলো মানুষের চাহিদা, ইচ্ছা, মানসিকতা বা প্রথা-ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এ বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'অতএব, তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা আসবে না এবং তারা তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেবে।'[৭৬] সুতরাং আচার-আচরণ, আকীদা-বিশ্বাস, মতবাদ এবং অপরাপর যে কোন বিষয়ের সমস্যার

---

৭১. আল-কুর'আন, ৪১ ঃ ৪২

৭২. আল-কুর'আন, ১৮ ঃ ২৭

৭৩. আল-কুর'আন, ১৫ ঃ ৯

৭৪. আল-কুর'আন, ৭৫ ঃ ১৬-১৭

৭৫. আল-কুর'আন, ১০ ঃ ১৫

৭৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৬৫

www.amarboi.org

সমাধানে ইসলামী আইন বিধানের অন্বেষণ করা এবং তা মেনে চলা সকল মুমিন মুসলিমের জন্য ফরয-অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, 'আল্লাহ্ ও রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর পক্ষে সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের কোন ক্ষমতা-ইখতিয়ার থাকে না। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে-বিরোধিতা করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।'[৭৭] সুতরাং বিনা দ্বিধায় ইসলামী বিধান পালন করা বাঞ্ছনীয়।

৬. এগুলো মেনে না নেয়া এবং এগুলোর বাস্তবায়ন না করা হারাম, নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌র বিধান অমান্যকরণ বা কোন বিধানের আংশিকও পালন না করা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্তি, দুঃখ কষ্ট ও সংকীর্ণতা ডেকে আনে এবং পরকালের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করে তোলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, 'যে আমার স্মরণ (বিধি-বিধান) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন,? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলি ভুলে গিয়েছিলে। আর এমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হয়েছে। আর এমনিভাবে আমি সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেব, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং তার পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী।'[৭৮]

৭. এগুলো অখণ্ড। এর কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ বর্জন করা নিষেধ। ইসলামের প্রতিটি বিধানের ওপরে ঈমান আনা এবং সামগ্রিকভাবে তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ইসলামী শরী'আতের কোন বিধানের অস্বীকৃতি, বিরোধিতা, লঙ্ঘন বা পালন না করা একই সাথে দুটি মারাত্মক পরিণতির কারণ। একটি জাগতিক এবং অপরটি পরকালীন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্

---

৭৭. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৩৬

৭৮. আল-কুর'আন, ২০ ঃ ১২৪-১২৭

www.amarboi.org

তা'আলা বলেন, তবে কি তোমরা কিতাবের তথা ইসলামী বিধানের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর ? অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।'[৭৯] তিনি আরও বলেন, 'যে কেউ রাসূলের এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধাচরণ করে, আমি তাকে ঐ দিকে ফিরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।'[৮০] অন্য আয়াতে আছে, 'যেসব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে, না হয় শূলে দিয়ে মারা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে দেয়া হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে; এ হচ্ছে তাদের জন্য দুনিয়ার শাস্তি। আর তাদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।'[৮১] এতে স্পষ্টতই প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামী বিধানের আংশিক বিশ্বাসী ও পালনকারী এবং আংশিক অস্বীকারকারী ও বর্জনকারীর শাস্তি দুনিয়াতে কঠোর এবং আখিরাতে কঠিন। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর বা পরিপূর্ণ ইসলাম পালন কর।'[৮২] 'অন্য আয়াতে আছে, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলিল আমর'-তথা উলামা-ফুকাহা ও উমারা-শাসকদেরও। আর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।'[৮৩]

---

৭৯. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৮৫

৮০. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৫

৮১. আল-কুর'আন, ৫০ ঃ ৩৩

৮২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২০৮

৮৩. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৫৯

www.amarboi.org

৮. মানব রচিত আইন-বিধানের মত ইসলামী বিধানে শুধু অপরাধের প্রকৃতি, শাস্তির ধরন বর্ণনা করা হয় না; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির বিবরণের সাথে আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকাল চিন্তা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয় যে, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ এবং পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আল্লাহ্‌র ভয় ও আখিরাতের চিন্তা যাদের মধ্যে নেই, তাদেরকে জগতের কোন আইন অন্যায়-অপরাধ ও পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। ইসলামী বিধানের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই পৃথিবীতে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছিল এবং এমন লোকদের একটি পরিবার ও সমাজ গঠন করেছিল, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।

সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরি প্রভৃতি জাতীয় অধিকার যা মূলত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ অথবা সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি, তাহলে আইন প্রয়োগ করে তা মীমাংসা করা যেতে পারে। কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের এতিম ছেলে মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকারকে তুলা দণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ্‌ভীতি এবং পরকালের জবাবদিহির ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় হতে পারে না।

৯. ইসলামী বিধানের সবকটিই আদল-ইনসাফ তথা ন্যায়পরায়ণতার সাথে সম্পৃক্ত। এটি ইসলামী বিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এতে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-অনাত্মীয়, আপন-পর, উঁচু-নিচু, ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বলের ভেদাভেদ নেই; সবাই সমান। কাউকে অনুগ্রহ করতে যেয়ে কাউকে নিগৃহ করা যাবে না। কথায়, কাজে, সাক্ষ্য-প্রমাণে, বিচার-আচারে, শাসন-প্রশাসনে, তথা ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত

www.amarboi.org

ইসলামের যত বিধান রয়েছে এর প্রত্যেকটিই ন্যায়ানুগ আদল বা ইনসাফপূর্ণ। একান্ত আপনজনের সাথেও কথা-বার্তায় ন্যায়ানুগ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, 'যখন তোমরা কথা বল, তখন ন্যায় কথা বলবে, যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়।'[৮৪] বিচারালয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেয়ার সময় ন্যায়ানুগ সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে যদি তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয়, তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, ন্যায়পরায়ণতায় রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশকাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই অবগত আছেন। (এর জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি প্রদান করবেন।)[৮৫] তিনি আরও বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়পরায়ণতা পরিত্যাগ কর না। ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।'[৮৬] সুতরাং ইসলামী বিধানে আপন-পর, শত্রু-মিত্র বা ধনী-গরীব নয়; ন্যায়পরায়ণতাই প্রধান ও চূড়ান্ত বিষয়। বিবাদমান দু'দলের মধ্যে মীমাংসার ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ্র বাণী একই রূপ। তিনি বলেন, 'তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।'[৮৭] কুরাইশ বংশের এক মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়েছিল। বিষয়টি চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইসলামের বিধান অনুযায়ী তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। মহিলাটি সম্ভ্রান্ত বংশের বিধায় কেউ কেউ তার শাস্তি লাঘব করার সুপারিশ করেছিলেন। মহানবী (স.) উত্তরে বললেন,

---

৮৪. আল-কুর'আন, ৬ ঃ ১৫২

৮৫. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৩৫

৮৬. আল-কুর'আন, ৫ ঃ ৮

৮৭. আল-কুর'আন, ৪৯ ঃ ৯

www.amarboi.org

জেনে রেখ, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এ জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা দুর্বল-নিচু বংশের লোকদেরকেই নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করত এবং উঁচু বংশের লোকদেরকে তা থেকে রেহায় দিয়ে দিত। যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, আজ যদি আমার মেয়ে ফাতিমা (রা.) চুরি করত তবে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।'[৮৮]

বিচারালয়ের রায় থেকে শুরু করে দৈনন্দিনের সাধারণ আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধান হচ্ছে তা যেন ন্যায়ভিত্তিক হয়। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার প্রাপকদের প্রত্যার্পণ কর। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে হুকুম করবে-বিচার করবে।'[৮৯]

ইসলামের বিধান মেনে জীবন-যাপনকারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ্ বলেন, 'আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি জাতি রয়েছে, যারা সত্যপথ দেখায় এবং সেই অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।'[৯০] অতএব, ইসলামী বিধান সুবিচার ও সমতার ওপর নির্ভরশীল। এতে কারো প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই, যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। 'আপনার পালনকর্তার কালাম বিধান, সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ।'[৯১]

১০. এ বিধানসমূহ ন্যাচারাল-স্বভাবসুলভ, সুসামঞ্জস্য ও বিজ্ঞানসম্মত। তাই এগুলোর অনুসরণ স্বভাবের দাবী। বেঁচে থাকার জন্য পানাহার ও মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা যতটা স্বাভাবিক, জীবনকে অর্থবহ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য ইসলামী বিধানের অনুসরণ ততটাই স্বাভাবিক। এর অন্যথা ক্ষণিকের তরে চমকপ্রদ হলেও মূলত তা অকার্যকর, ক্ষতিকর, স্বভাববিরোধী ও অগ্রহণযোগ্য। ইসলামী বিধানের এ বৈশিষ্ট্যের কথা পবিত্র কুর'আনে বহুবার এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তারা কি আল্লাহ্র দীন

---

৮৮. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০০৩

৮৯. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৫৮

৯০ আল-কুর'আন, ৭ ঃ ১৮১

৯১. আল-কুর'আন, ৬ ঃ ১১৫

www.amarboi.org

তথা ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোন বিধান তালাশ করছে? অথচ আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তারই কাছে তারা ফিরে যাবে।'[৯২] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় A. Yosuf Ali বলেন, All nature adores God, and Islam asks for nothing peculiar or rectarien; It but asks that we follow our nature and make our will conformable to Gods will as seen in nature, history, and revelations. Its message is universal [৯৩] অন্য আয়াতে আছে, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম-বিধান চায়, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৯৪] সুতরাং যেসব বিধানে পারলৌকিক মুক্তি পাওয়া যাবে না, সেসব বিধানে জাগতিক শান্তি আসতে পারে না- এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক চলন্ত প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে।'[৯৫] প্রাণী জগতের বিচরণের জন্য যে পদ্ধতি মহান স্রষ্টা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এর বাইরে যাওয়ার কোন এখতিয়ার তাদের নেই। নিজস্ব ক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভ করতে হলে প্রত্যেক বস্তুকে-প্রাণীকে তার জন্য নির্দিষ্ট বিধানের অধীনে থাকতে হবে। মূলত প্রতিটি জীব, প্রতিটি পদার্থ, প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহ্র নির্ধারিত নিয়মের আনুগত্য করে চলেছে। 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর (আল্লাহ্র)। সকলে তাঁর বিধানানুসারে চলছে-সকলেই তাঁর আজ্ঞাবান।'[৯৬] সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে, তৃণলতাও তারই বিধান মেনে চলে। তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং পৃথিবীতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন।

---

৯২. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ৮৩

93 A. Yosuf Ali, *The Glorious Qura n,* American Trust Publications, 1977, P. 144

৯৪. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ৮৫

৯৫. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৪৫

৯৬. আল-কুর'আন, ৩০ ঃ ২৬

www.amarboi.org

প্রকৃতির এ ভারসাম্য রক্ষা করা মানুষের দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক ধর্ম।'[৯৭]

১১. এ বিধানসমূহ বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার মাঝামাঝি একটা অবস্থানের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চাল-চলন, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আইন-আদালত সর্বক্ষেত্রেই এই নীতিটি ক্রিয়াশীল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'নামাযে (ক্বেরাত পড়ার সময়) স্বর অতি উচ্চ কর না, অতিশয় হীনও কর না। এতদোভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।'[৯৮] 'পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর'।[৯৯] অর্থাৎ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড়ঝাপসহ চল না, যা সভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চল না, যা অহংকারী বা রোগাক্রান্তদের চলা। সঞ্চয় বা ব্যয় সম্পর্কে ইসলামের নীতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'তুমি তোমার হাতকে তোমার ঘারের সাথে দৃঢ় সংলগ্ন করে গুটিয়ে রেখ না এবং সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দিও না।'[১০০] হাতকে ঘাড়ের সাথে সংলগ্ন বলতে কৃপণতা এবং প্রসারিত বলতে অপব্যয়কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাদের প্রশংসায় অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না-অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তারা এতদোভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনে জীবন যাপন করে।'[১০১] বস্তুত, ইসলামী বিধানসমূহ এমন পরিমিত ও সুসমন্বিত যে, পারিবারিক শান্তি ও বিশ্ব শান্তির জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোন বিধান হতে পারে না।

---

৯৭. আল-কুর'আন, ৩০ ঃ ৩০

৯৮. আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ১১০

৯৯. আল-কুর'আন, ৩১ ঃ ১৯

১০০. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ২৯

১০১. আল-কুর'আন, ২৫ ঃ ৬৭

www.amarboi.org

১২. এ বিধানসমূহ প্রথমে ব্যক্তি ও পরে সমষ্টির গঠন ও সংশোধনের নীতিতে প্রবর্তিত। নিজের ভাল-মন্দের কথা চিন্তা না করে অন্যের কল্যাণ সাধনের রীতি ইসলামী বিধানের পরিপন্থী। নিজে বাঁচ, অন্যকে বাঁচাও, নিজে শেখ, অন্যকে শেখাও, নিজে খাও, অন্যকে খাওয়াও, নিজে সৎকাজ কর, অন্যকে সৎকাজ করতে বল; নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক, অন্যকে বিরত রাখ; এই প্রক্রিয়ায় সংস্কার করার বিধান রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটি কুর'আন ও হাদীসের অনেক বাণীতেই বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।'[১০২] অন্য আয়াতে আছে- يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا "ওহে যারা বিশ্বাস করেছ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।'[১০৩] 'তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর; তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না-বুঝবে না?'[১০৪] 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলাটা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক।'[১০৫] কুরবানীর মাংস খাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন, 'অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাগ্রস্তকে আহার করাও।'[১০৬] অন্য আয়াতে আছে, অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু চাই না তাকে এবং যে চায় তাকেও।'[১০৭] 'যে ব্যক্তি সৎকাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্য করে; আর যে অসৎকাজ করে, তা তার ওপর বর্তাবে।'[১০৮] যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করে

---

১০২. আল-কুর'আন, ৫ : ১০৫

১০৩. আল-কুর'আন, ৬৬ : ৬

১০৪. আল-কুর'আন, ২ : ৪৪

১০৫. আল-কুর'আন, ৬২ : ২-৩

১০৬. আল-কুর'আন, ২২ : ২৮

১০৭. আল-কুর'আন, ২২ : ৩৬

১০৮. আল-কুর'আন, ৪১ : ৪৬

www.amarboi.org

না।'[১০৯] মহানবী (স.) কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আপনি একাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যান; কেউ আপনার সাথে থাকুক বা না থাকুক। আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলিমদের উৎসাহিত করতে থাকুন।'[১১০] মহানবী (স.) নিজেও বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা কুর'আন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়।'[১১১] তিনি আরও বলেন, খবরদার! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[১১২] এতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকটি মানুষকে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করাই ইসলামী বিধানের লক্ষ্য।

১৩. এ বিধানসমূহ আত্মরক্ষা বা প্রতিরক্ষামূলক; আক্রমণাত্মক নয়। স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায়-অবিচার, নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘনের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। তারপরও কেউ নির্যাতিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত-অপমানিত ও আক্রান্ত হলে তা প্রতিরোধ করা, প্রতিবাদ করা, নিজের জীবন-সম্পদ-সম্ভ্রম ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবিধান করা বা কারো সংশোধনের নিমিত্তে প্রয়োজন অনুযায়ী কঠোরতা অবলম্বন করা দোষের তো নয়ই; বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

১৪. ইসলামী বিধানসমূহের সাথে অমলিন হৃদয়, বিশুদ্ধ নিয়্যাত, সদিচ্ছা ও আল্লাহ্ভীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আর এটিই হচ্ছে ইসলামী বিধানের সঞ্জীবনী শক্তি। এ শক্তি বলেই মানুষ লোকচক্ষুর অন্তরালেও ইসলামী বিধান পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে এবং মেনে চলে। বিধান পালনের এ নিশ্চয়তা জাগতিক কোন আইন বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোন সংস্থার পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। দৈনিক পাঁচবার সময়মত নামায আদায় করা যত কঠিনই হোক না কেন, খুশু'-খুযু' অবলম্বনকারী লোকদের

---

১০৯. আল-কুর'আন, ৬ ঃ ১৬৪

১১০. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৮৪

১১১. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮

১১২. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৩

www.amarboi.org

জন্য তা মোটেই কঠিন নয়।[১১৩] ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণে সীমালঙ্ঘন বা অত্যাচার করে না কেবল তারাই যাদের হৃদয় অমলিন ও আল্লাহ্‌ভীতিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং নিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌ভীতি ছাড়া কোন কাজেই সর্বাঙ্গীন সুফল আশা করা যায় না। কুরবানীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর পশুর রক্ত ও মাংস কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না; বরং পৌঁছায় তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া-নিষ্ঠা-আন্তরিকতা।'[১১৪]

১৫. ইসলামী বিধানে এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য যা ক্ষতি বহন করে। মদ, জুয়া, লটারী, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিতে কিছু উপকার বাহ্যতঃ পরিলক্ষিত হলেও সামগ্রিক বিচারে এগুলোতে ক্ষতির পরিমাণই বেশী। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব সর্বজনবিদিত। এ জন্যই ইসলামী বিধানে তা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভাবে কোন অমুসলিম কাফির বা মুশরিকের সাথে কোন মুসলিম নারী-পুরুষের বিয়ে হতে পারে না; তা যত আকর্ষণীয় ও মোহনীয়ই হোক না কেন। কারণ, বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।[১১৫] তাই যখন কোন কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতির কারণও থাকে, সেক্ষেত্রে সুস্থ বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে, লাভের কাল্পনিক ও সাময়িক সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে সমূহ ক্ষতির হাত থেকে নিজেকে ও জাতিকে রক্ষা করা। বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলে হয়তো কোন অমুসলিম মুসলিম পরিবারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে; তবে সতর্কতার বিষয় হল, কোন মুসলিম অমুসলিমের প্রভাবে ধর্মান্তরিত হয়ে যেন কাফির-মুশরিক না হয়ে যায়।

১৬. ইসলামের পারিবারিক আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অধিকার ও দায়িত্ব পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ শুধু

---

১১৩. আল-কুর'আন, ২ঃ ৪৫-৪৬

১১৪. আল-কুর'আন, ২২ঃ ৩৭

১১৫. আল-কুর'আন, ২ঃ ২২১

www.amarboi.org

মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়; বরং স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্কের বিষয়টিও এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকারের পাশাপাশি দায়িত্বের প্রশ্নটি উচ্চারিত না হলে প্রকৃতপক্ষে তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। সে তখন হয়ে যায় একটি হিংস্র জন্তু, একটি নেকড়ে অথবা শয়তান।[১১৬]

বস্তুত, 'যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে আগ্রহী, এ বিধানসমূহের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন। তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করেন।'[১১৭] তাই বলা যায় যে, ইসলামী বিধান মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, যাবতীয় কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয় এবং সঠিক পথে জীবন যাপন করতে সর্বোতভাবে সহায়তা করে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে শান্তির জন্য ইসলামী বিধি-নিষেধ থেকে সুফল পাওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ

ইসলামী বিধি-নিষেধসমূহ শান্তির মহিমায় সমুজ্জল। এগুলোর সত্যতা, যথার্থতা, যৌক্তিকতা, মানবিকতা, নির্ভরযোগ্যতা, যুগোপযোগিতা ও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে **প্রথমেই** দৃঢ় আস্থা, অনঢ় বিশ্বাস ও ইস্পাত কঠিন প্রত্যয় মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান সম্পর্কে সামান্যতম সংশয়, অসামঞ্জস্যতা বা অপকারিতার ধারণাও কারো মনে থাকলে তা থেকে শান্তি, নিরাপত্তা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধানের প্রতি যাদের খাঁটি ঈমান রয়েছে এবং

---

১১৬. ড. মুহাম্মদ হামিদ উল্লাহ, *ইসলামের পরিচয়,* অনু, মুহাম্মদ লুৎফুল হক, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) , পৃ. ১৬২-১৬৩

১১৭. আল-কুর'আন, ৫ ঃ ১৬

www.amarboi.org

শিরক, বিদ'আত, প্রতারণা ও বাতিলের মিশ্রণ ঘটিয়ে যারা স্বীয় ঈমানকে নষ্ট করে না; ইসলামী বিধি-নিষেধ অনুসরণে তারাই পূর্ণাঙ্গ সফলতা, নিরাপত্তা ও সুপথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় ঈমানকে যুল্‌ম তথা শিরকের সাথে মিশ্রণ ঘটায় না, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হল সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'[১১৮] পার্থিব শান্তি ও পরকালীন মুক্তি ঐসব মানুষের জন্য নির্ধারিত, যারা নিখুঁতভাবে তা পালন করে। দুঃশ্চিন্তা, হতাশা, দুঃখ-কষ্ট ও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন তারা ইহজীবনে যেমন হবে না; পরকালেও তারা সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে থাকবে।[১১৯] বস্তুত দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্যই ইসলামের বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।[১২০]

দ্বিতীয়ত, ইসলামী বিধান জেনে-বুঝে পালন করতে হয়। এগুলো জানা ও বুঝা নারী-পুরুষ সবার জন্য অপরিহার্য। দাম্পত্য ও পারিবারিক বিধান, উত্তরাধিকার আইন, হালাল-হারামের বিধান, ইবাদাত-বন্দেগীর নিয়ম-কানুন ইত্যাদির সাথে কেবল পুরুষরাই সম্পৃক্ত নয়; বরং নারী-পুরুষ সবাইকে এগুলোর আদলে জীবন যাপন করতে হয়। জীবন-মরণের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো-বিধানগুলো জানা সব মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।[১২১] হাদীসে আছে, 'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরয'।[১২২] কুর'আন মাজীদের সূরা আল-বাকারা, সূরা আন-নিসা, সূরা আন-নূর, সূরা আল-আহযাব ও সূরা আত-তালাকে বর্ণিত বিধানগুলোর অধিকাংশই নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। পাক-পবিত্রতা ও পর্দা সংক্রান্ত কিছু বিধান রয়েছে যা কেবল নারীদেরই জানার ব্যাপার। উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম নারীই এ ব্যাপারে ভীষণ উদাসীন ও অনবহিত অবস্থায় জীবন যাপন করে থাকে।

---

১১৮. আল-কুর'আন, ৬ ঃ ৮২

১১৯. আল-কুর'আন, ২৯ ঃ ৬১

১২০. আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ১০২, ৩ ঃ ১৩৯

১২১. আল-কুর'আন, ৪৭ ঃ ১৯, ৯৬ ঃ ১-৫, ৩৫ ঃ ২৮, ৩৯ ঃ ৯, ৬৭ ঃ ১০

১২২. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪

www.amarboi.org

ফলে পুরুষ কর্তৃক হয় নিগৃহিত-নির্যাতিত। মূলত, ইসলামী বিধান সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও অপব্যাখ্যার কারণে দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বিধানসমূহ এজন্যই বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ এর উপকারিতা ও কার্যকারিতা জানতে ও বুঝতে পারে। আল্লাহ্ বলেন, 'এই দৃষ্টান্তসমূহ আমি মানুষের বোধগম্যতা ও কল্যাণের জন্য বর্ণনা করি; আর এগুলো জ্ঞানীরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।'[১২৩] তিনি আরও বলেন, 'এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে তাঁর বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।'[১২৪] তাই এটি নিশ্চিত যে, ইসলামী বিধি-নিষেধের ভাল-মন্দের দিক বুঝতে হলে নারী-পুরুষ সবাইকে তা জানতে হবে। কারণ কোন বিষয় সম্পর্কে জানা ছাড়া তার ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে কেউ বুঝতে পারে না।

তৃতীয়ত, ইসলামী বিধান সামগ্রিকভাবে পালন করতে হবে। কারণ, এগুলো অখণ্ড, অবিভাজ্য। অর্থাৎ কোন একটি বিধান বিশেষ কোন ক্ষেত্রে মেনে চলা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান মেনে না চলা বা পালন না করার অনুমতি ইসলামে নেই। উদাহরণত, নামায আদায় করে যাকাত আদায় না করা, সন্তানাদির প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে স্বামীর প্রতি স্ত্রী বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবহেলা, উপেক্ষা-নির্যাতন মোটেও বিধিসম্মত নয়; হতে পারে না। পারিবারিক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে যদি কোন স্ত্রী পর-পুরুষের সাথে বা কোন স্বামী পর-নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে তাহলেও পারিবারিক স্থিতি, শান্তি ও সৌন্দর্য কিছুতেই অক্ষুণ্ন থাকবে না; সেখানে বিপর্যয়-ভাঙ্গন আসবেই।[১২৫] কাজেই সামগ্রিকভাবে, পূর্ণাঙ্গরূপে এ বিধানসমূহ পালন করার চেষ্টা করতে হবে।

চতুর্থত, প্রতিটি বিধান সর্বোত্তমভাবে পালন করা প্রয়োজন। কোন বিধান

---

১২৩. আল-কুর'আন, ৯১ ঃ ৪৩

১২৪. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৬১

১২৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৮৫ নং আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর দ্র.

www.amarboi.org

কার্যকর করার পদ্ধতি যথাক্রমে সাধারণ, উত্তম এবং সর্বোত্তম এই তিনটি পর্যায় রয়েছে। উদাহরণত, নামাযের মধ্যে সবগুলো কাজ ফরয নয়; এতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব-সব পর্যায়ের বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নামায আদায়ের সময় ফরয-ওয়াজিব পর্যায়ের কাজগুলো আদায় হলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায় মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সুন্নাত-মুস্তাহাবসহ জামা'আতের সাথে আদায় করলে তা সর্বোত্তম উপায়ে আদায় হয় এবং অধিক পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়। দাম্পত্য ও পারিবারিক বিধানগুলোও এমনি সর্বোত্তম উপায়ে পালন করতে পারলে পারিবারিক জীবন অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও শান্তি-সুখের হয়ে ওঠবে। সর্বোত্তম পন্থায় কারো সাথে মিলে-মিশে চলতে পারলে চরম শত্রুও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।[১২৬] এ জন্য কারো সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেও সর্বোত্তম পন্থায় তা করার পরামর্শ দিয়েছে ইসলাম।[১২৭] কাজেই পারিবারিক জীবনে পালনীয় বিধানগুলো সর্বোত্তমরূপে পালন করা প্রয়োজন। স্ত্রীকে মোহরানা প্রদানের মত ফরয দায়িত্বটি জোরপূর্বক নয়; মনের খুশিতে নির্বিবাদে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে ইসলামে।[১২৮]

পঞ্চমত, এ বিধানসমূহ সবসময় পালন করতে হবে। একদিন, একমাস বা একবছর পালন করে ছেড়ে দিলে চলবে না। সারা জীবন তা পালন করে যেতে হবে। কারণ, মানুষের প্রয়োজন ক্ষণিকের নয়; সার্বক্ষণিক। তাই আল্লাহ্র নির্দেশ, 'আর তুমি তোমার ব্যক্তিগত-পারিবারিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তোমার প্রভুর দাসত্ব করতে থাক।'[১২৯] অর্থাৎ ইসলামের বিধান মৃত্যু পর্যন্ত পালন করে যেতে হবে। জীবনের বাঁকে বাঁকে যখন যে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ ইসলাম মানুষকে দিয়েছে, তা আজীবন করে যেতে হবে।

---

১২৬. আল-কুর'আন, ৪১ : ৩৪

১২৭. আল-কুর'আন, ১৬ : ১২৫

১২৮. আল-কুর'আন, ৪ : ৪

১২৯. আল-কুর'আন, ১৫ : ৯৯

www.amarboi.org

পরিবার গঠন বিষয়ে ইসলামী বিধি-বিধান

বিয়ের পরিচয়

বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন বিশ্বপ্রকৃতির এক অমোঘ বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টিরই জোড়া সৃষ্টি করেছেন; যাতে করে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।[১৩০] ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র বৈধ পথ হচ্ছে বিয়ে। বিয়ে ছাড়া অন্য কোন পথে বা অন্য কোন উপায়ে নারী-পুরুষের মিলন ও সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দত্তক, পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আশ্রয় গ্রহণ, গোপনীয় কোন সম্পর্ক, পরীক্ষামূলক বিয়ে সম্পর্ক, মূতা বিয়ে ইসলামী বিধানে পারিবারিক বন্ধন বলে স্বীকৃত নয়। এ সবই সীমালঙ্ঘন। কারণ, ইসলামে পরিবারের ভীত হচ্ছে রক্তের বাঁধন এবং বিয়ের সম্পর্ক। বিয়ের আরবী প্রতি শব্দ হচ্ছে 'নিকাহ'। এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া। শরী'আতের পরিভাষায়, নিকাহ হচ্ছে এমন একটি চুক্তির নাম, যার দরুন পরস্পরের ওপর অধিকার আরোপিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

অন্য কথায়, বিয়ে বা নিকাহ্ হল সমাজ পরিসরে স্রষ্টাপ্রদত্ত বিধান অনুযায়ী একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে এমন এক বন্ধন ও সম্পর্ক স্থাপন; যার কারণে যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যায়। একজন আরেক জনের ওপর সুনির্দিষ্ট অধিকার লাভ করে এবং একজনের জন্য অপর জনের ওপর বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে ও পরিবার সম্পূর্ণরূপে একটি দেওয়ানী চুক্তির ফল। নারী নিজেকে বিয়ের জন্য উপস্থাপন করা এবং পুরুষের তা গ্রহণ করা-এ ইজাব ও কবূল দ্বারাই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরই ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে

---

১৩০. আল-কুর'আন, ৫১ ঃ ৪৯

www.amarboi.org

দাম্পত্য জীবন শুরু করার সুযোগ লাভ করে এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতগুলো অধিকার নির্দিষ্ট হয়।[১৩১] বস্তুত, বিয়ে হচ্ছে ইসলামী পরিবার গঠনের একমাত্র ভিত্তি। একজন পুরুষ ও একজন নারী বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস ও স্থায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বিয়ের গুরুত্ব

দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর জন্য বিয়ে করা জরুরী। যৌবনের উন্মাদনা যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছে, যা ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর জন্য বিয়ে করা সবার ঐক্যমতে ফরয। দাউদ জাহেরী ও তাঁর অনুসারীরাও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁরা কুর'আনের বাণী, 'অতএব, তোমরা নারীদের মধ্য থেকে যাদের পছন্দ হয়, তাদেরকে বিয়ে কর'[১৩২] -কে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। ইমাম শাফেয়ী' (রহ.) বলেন, বিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের মত একটি বৈধ ব্যাপার। আল্লাহ্র বাণী, 'আর তোমাদের জন্য হালাল করা হল'[১৩৩]-তে বিয়ের বৈধতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া 'লাকুম' শব্দটিও বৈধতা বা অনুমতিকে বুঝায়। ইমাম কারখী (রহ.) বলেন, বিয়ে ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। তিনি হযরত ইবন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। মহানবী (স.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তারা বিয়ে করা উচিত। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে।'[১৩৪] এখানে রোযা রাখাকে বিয়ের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এটা স্পষ্ট যে, অসমর্থ ব্যক্তির জন্য বিয়ের পরিবর্তে রোযা রাখা

---

১৩১. বিস্তারিত দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ৫৬০

১৩২. আল-কুর'আন, ৪ : ৩

১৩৩. আল-কুর'আন, ৪ : ২৪

১৩৪. সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭৫৭-৭৫৮

www.amarboi.org

ওয়াজিব নয়। 'দুররে মুখতার' গ্রন্থে রয়েছে, হানাফীদের মতে, বিয়ে অবস্থাভেদে ওয়াজিব বা ফরয হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বস্তুত, বিয়ে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যেমন মহানবী (স.) বলেন, 'বিয়ে আমার সুন্নাত বা রীতির একটি। যে আমার সুন্নাত বা রীতি থেকে বিমুখ থাকবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[১৩৫] শর্তব্য যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকতে হবে। মূলত আল্লাহ্ তা'আলা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যই পুরুষের সাথে নারীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশ বিস্তার ঘটাবেন।[১৩৬] পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তারা প্রায় সবাই বিয়ে করেছেন। বিয়ে হল নবী-রাসূলগণের স্থায়ী সুন্নাত। চারটি কাজ নবীগণের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য। এগুলো হচ্ছে সুগন্ধি ব্যবহার করা, বিয়ে করা, মিসওয়াক করা ও খৎনা করা।[১৩৭]

বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষের অবিবাহিত থাকা মোটেও উচিত নয়। কারণ অবিবাহিত জীবন সাধারণত পবিত্র ও পরিতৃপ্ত জীবন হয় না। অবশ্য যে বিয়ে করতে সক্ষম নয়, তার কথা স্বতন্ত্র। বিয়ে খাওয়া, পরা ও ঘুমানোর মত একটি মৌলিক প্রয়োজন। এগুলো পূরণ না করে শুধু আল্লাহ্র ইবাদতে নিয়োজিত থাকা মহানবী (স.) এর আদর্শের পরিপন্থী। মহানবী (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।'[১৩৮] বস্তুত বিয়ে স্বভাবের দাবী, মানব প্রকৃতিতে নিহিত প্রবণতার স্বাভাবিক প্রকাশ। মানবতার দৃষ্টিতেও এটি অত্যন্ত জরুরী। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) সমাজের যুবক-যুবতীদের সম্বোধন করে বলেছেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে,

---

১৩৫. সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭৫৮

১৩৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১

১৩৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *জামে' তিরমিযী*, (দিল্লী : আমিন কোম্পানী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১২৮

১৩৮. দারেমী, কিতাবুন নিকাহ, খ. ২, পৃ. ২০৫

www.amarboi.org

তাদের বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা, বিয়ে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকারী; যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা হবে তার জন্য ঢালস্বরূপ।'[১৩৯] তিনি আরও বলেন, 'যে বিয়ে করল সে নিশ্চয় তার দীনের অর্ধেকের হেফাযত করল। সুতরাং সে যেন বাকী অর্ধেকের হেফাযতের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে।'[১৪০] বস্তুত মানব জীবনে বিয়ে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দিক যা ছাড়া মানুষ তার মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

বিধি সম্মতভাবে বিবাহিত হয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করা প্রত্যেক বয়স্ক ও সক্ষম নারী-পুরুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এতে যেমন সুষ্ঠু ও শান্তি পূর্ণ জীবন সম্ভব, তেমনি যৌন মিলনে স্বাভাবিক অদম্য ও অনিবার্য স্পৃহাও সঠিকভাবে ও নির্ভেজাল পরিতৃপ্তিসহকারে পূরণ হয়ে থাকে। বৈবাহিক জীবন ব্যতিত যৌনস্পৃহা পূরণে যে কোন পথই গোটা মানবতার জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। সমকামিতাসহ অবাধ যৌনাচারের সব কয়টিই অত্যন্ত ঘৃণিত, হীন, বীভৎস ও জঘন্য। এর ফলে মানুষের মনুষত্ব চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়, মানুষের জীবনী শক্তি ও প্রজনন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। যে উদ্দেশ্যে মানুষকে নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এসব অন্যায় অপকর্মে তা বিনষ্ট ও ব্যর্থ হয়ে যায়। বিবাহিত হয়ে সুস্থ ও পবিত্র জীবন যাপন করা এবং স্থায়ী যৌন মিলন ব্যবস্থায় পরিতৃপ্ত হওয়া এসব কুঅভ্যাসের লোকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিয়ে করে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির ভরণপোষণ করাকে তারা অতিরিক্ত বোঝা মনে করে থাকে। এজন্যই ইসলামে এসব অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে।[১৪১] ইসলামী বিধানে যৌনস্পৃহা পূরণের একমাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে

---

১৩৯. সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, পৃ. ৭৫৮

১৪০. উদ্ধৃত, আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযযালী (র.), *ইহইয়াউ 'উলূম আল-দ্বীন,* (বাইরুত : দারুল মা'রিফা, তা. বি.) খ. ১, পৃ. ২২

১৪১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, আল-কুর'আন, ২৬ ঃ ১৬৫-১৬৬, ১৫ ঃ ৭৩-৭৫, ৪ ঃ ১৬ এবং এর তাফসীরসমূহ

www.amarboi.org

বিবাহিত স্ত্রী। এছাড়া অন্য যে কোন উপায় সম্পূর্ণ হারাম ও পরিত্যাজ্য। আল্লাহ্ তা'আলা সার্থক-সফল মুমিন-মুসলিমের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 'আর সফলকাম হবে সেসব মুমিন-মুসলিম, যারা তাদের যৌনাঙ্গকে স্ত্রী ছাড়া অন্য যে-কোন অপকর্ম থেকে পূর্ণ হেফাযত করে।..'[১৪২]

ইসলামে নৈতিক চরিত্রকে সমুন্নত রাখার ও সংরক্ষণ করার প্রতি যেভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা জীবন বিধানে তা দেখা যায় না। বরং বলা যায় যে, কোন মানব রচিত আইনে তার দৃষ্টান্ত নেই। এজন্য মহানবী (স.) নও-মুসলিম নর-নারীদের কাছ থেকে বিশেষভাবে যেসব বিষয় পরিহার করার শপথ নিতেন, তন্মধ্যে ব্যাভিচার একটি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে নবী ! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।'[১৪৩] ব্যভিচারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।'[১৪৪] আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাহর পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আর যারা ব্যভিচার করে না, তারাই আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাহ।'[১৪৫]

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব যে কতখানি তা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। অন্যান্য ধর্ম ও সমাজেও বিয়ের প্রচলন রয়েছে এবং এর গুরুত্বও স্বীকার করা হয়। তবে বিয়ের গুরুত্বের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম

---

১৪২. আল-কুর'আন, ২৩ ঃ ৫-৬

১৪৩. আল-কুর'আন, ৬০ ঃ ১২

১৪৪. আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ৩৩

১৪৫. আল-কুর'আন, ২৫ ঃ ৬৮

www.amarboi.org

অবৈধ পন্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। সমাজে বিয়ের প্রচলনের মাধ্যমেই কেবল যৌন অনাচার প্রতিরোধ ও নৈতিক পবিত্রতা রা করা সম্ভব। বিয়ে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য উপকারী, তৃপ্তি ও প্রশান্তি আনয়নকারী, আনন্দবর্ধক, মিতচারিতার সহায়ক এবং দুনিয়া ও আখিরাতে উন্নত জীবন লাভের মাধ্যম। সামাজিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের কোন তুলনা হয় না। অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত ও সুস্থ থাকার এটি একা মহৌষধ।[১৪৬]

বিয়ে এক পবিত্র বন্ধন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা কোন প্রকার ঠুনকো বা অস্থায়ী সম্পর্ক নয়; বরং এ এক চিরস্থায়ী ও শাশ্বত সম্পর্ক। এ সম্পর্ক আখিরাতের জীবন পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক আগ্রহ প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর থাকা উচিত। পৃথিবীতে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করে যেতে পারলে তাদের পরকালের জীবনও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে একত্রে কাটবে।[১৪৭]

বিয়ের উদ্দেশ্য

বিয়ে এবং বিবাহিত জীবনের বিশেষ কতগুলো মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। কুর'আন ও হাদীসে এসব উদ্দেশ্যের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এতদসম্পর্কিত কুর'আন-হাদীসের বাণীসমূহকে বিশ্লেষণ করলে বিয়ের যেসব উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো হল-

ক. স্বীয় সতীত্ব ও নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখা;

খ. আনন্দ-ফুর্তি, তৃপ্তি, প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ করা;

গ. সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ও সমাজের জন্য যোগ্য মানুষ গড়ে তোলা;

ঘ. সন্তানের মধ্যে প্রাথমিক মূল্যবোধের সৃষ্টি ও তাকে সামাজিকীকরণ;

---

১৪৬. মওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ., *যুক্তির আলোকে ইসলামের বিধান*, অনুবাদ, হাফেজ মওলানা মুজীবুর রহমান, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ১৪২

১৪৭. আল-কুর'আন, ৩৬ ঃ ৫৬, ৪৩ ঃ ৬৬-৭৩

www.amarboi.org

ঙ. আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা;

চ. পারিবারিক পরিধি বিস্তৃতকরণ এবং সমাজে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ ও

ছ. কর্মপ্রচেষ্টা, সাধনা ও ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি।

নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল :

বিয়ের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় সতীত্ব ও নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখা। সৃষ্টির সেরাজীব মানুষের স্বভাব-চরিত্র, নৈতিক আদর্শ, ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে সব ধরনের নোংরামী, পশুত্ব, বর্বরতা ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করাই হল বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর মুহাররামাত নারীরা ছাড়া অন্যসব নারীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল-বৈধ করে দেয়া হল এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজের অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে চাইবে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য; ব্যভিচারের জন্য নয়।[১৪৮] তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের জন্য হালাল করা হল সতী-সাধ্বী মুসলিম নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে। যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য; জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়।'[১৪৯]

এ দু'টো আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে বিয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন যে, বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের চরিত্রকে পবিত্র ও কলঙ্কমুক্ত রাখা, স্থায়ীভাবে পারিবারিক জীবন গঠন করা ও স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে নারীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে; ব্যভিচারিণী বা উপপতি গ্রহণকারিণী হবে না।'[১৫০] এ আয়াত থেকে নারী যে উদ্দেশ্যে বিয়ে করবে তা জানা গেল। আর তা হল, নারীদের সতী-সাধ্বী হওয়া, পরিবার গঠন

---

১৪৮. আল-কুর'আন, ৪ : ২৫

১৪৯. আল-কুর'আন, ৫ : ৫

১৫০. আল-কুর'আন, ৪ : ২৫

www.amarboi.org

করা, যেনা-ব্যভিচার বন্ধ করা ও গোপন বন্ধুত্ব করে যৌনসাধ আস্বাদন করার সব পথ বন্ধ করা। উপরিউক্ত প্রথম দু'টো আয়াতে পুরুষদের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতটিতে সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর নারীদের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আর এ তিনটি আয়াতে পরিবারের দুর্জয় দুর্গ রচনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ তিনটি আয়াতেই বিয়েকে (حصن)-হিসন-দুর্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। দুর্গ যেমন মানুষের নিরাপদ আশ্রয় স্থল, শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, বিয়ের ফলে গঠিত পরিবারও তেমনি স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র সমুন্নত রাখার একমাত্র রক্ষা কবজ।

বিয়ে না করলে চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে থাকে। যে কোন দুর্বল মুহূর্তে মানুষ আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন করে পাপের পঙ্কিল আবর্তে পড়ে যেতে পারে। মহানবী (স.) যুব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা, বিয়ে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকারী এবং যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা হবে তার জন্য উপশমকারী।'[১৫১] বস্তুত, বিয়ে হচ্ছে চরিত্রকে পবিত্র রাখার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

বিয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী-পুরুষের হৃদয়ের গভীর ভালবাসা, চরম আবেগ-উচ্ছ্বাস ও অকৃত্রিম সোহাগের পরম তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة - 'আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের একটি হল এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যেন তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) কাছে শান্তি লাভ করতে পার এবং তিনিই (আল্লাহ্ই) তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে প্রীতি-ভালবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করে দেন।'[১৫২] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আলূসী (রহ.) বলেন,

---

১৫১. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৮

১৫২. আল-কুর'আন, ৩০ : ২১

www.amarboi.org

তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শরী'আতের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বিয়ের মাধ্যমে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রেম-প্রণয় এবং মায়া-মমতা-দরদ সহানুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অথচ পূর্বে তোমাদের মাঝে না ছিল তেমন কোন পরিচয়, না নিকট আত্মীয় বা রক্ত সম্পর্কের কারণে মনের কোন সুদৃঢ় সম্পর্ক।'[১৫৩]

সুখ-শান্তি, তৃপ্তি ও অনাবিল আনন্দ লাভই হচ্ছে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সব মানুষই সমান। ধনী-গরীব, আশরাফ-আতরাফ, বর্ণ, গোত্র, দেশ-কাল, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব নারী পুরুষই এক ও অভিন্ন। নারী এ শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে একমাত্র পুরুষের কাছ থেকে এবং পুরুষ তা পেতে পারে কেবল মাত্র নারীর সান্নিধ্য থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা (আল্লাহ্) যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র অস্তিত্ব (সত্তা) থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া; যাতে সে তার কাছে শান্তি পেতে পারে।'[১৫৪] নারী পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ একটি স্বভাবজাত ব্যাপার। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একজন অপরজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানব মনের এ চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা একমাত্র বৈবাহিক জীবন যাপনে পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

হযরত হাওয়া ও আদম (আ.)-এর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন হযরত আদম (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি হাওয়া। আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে, তুমি আমার কাছে শান্তি লাভ করবে আর আমি শান্তি লাভ করব তোমার কাছ থেকে।'[১৫৫] তাই মহানবী (স.) বলেছেন, 'কোন নারী যখন তোমাদের কারো মনে কামস্পৃহা জাগিয়ে দেয়, তখন সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় উত্তেজনার উপশম করে নেয়। এর ফলে সে তার মনের

---

১৫৩. *তাসীর রুহুল মা'আনী*, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৩১

১৫৪. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ১৮৯

১৫৫. আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবন আহমদ আইনী, *'উমদাতুল ক্বারী*, (বাইরুত : ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১১২

www.amarboi.org

আবেগের সান্ত্বনা লাভ করতে পারবে এবং মনের সব অস্থিরতা ও উদ্বেগ মিলিয়ে যাবে।'[১৫৬] তাই একজন নারী বা পুরুষের জীবনে বিয়ে চঞ্চলতা ও দুরন্তপনা দূর করে তাকে ধীর-স্থির ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে সহায়তা করে।

বিয়ে ও বিবাহিত জীবনের তৃতীয় উদ্দেশ্য সন্তান জন্মদান ও বংশ বিস্তার। বৈবাহিক জীবনে সন্তান লাভ করে মানব বংশের পবিত্রতা ও গতিশীলতা রা করার মত মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। কুর'আন ও হাদীসের অসংখ্য বাণীতে এ উদ্দেশ্যটির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'فالئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم- 'অতঃপর এখন তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা সন্ধান কর।'[১৫৭] جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا يذرؤكم فيه- 'তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া বানিয়েছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকেও তাদের জুড়ি বানিয়েছেন। আর এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।'[১৫৮] তিনি আরও বলেন, 'আর তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী।'[১৫৯] মহানবী (স.) বলেন, 'তোমরা বিয়ে কর। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব;... ।'[১৬০]

সন্তানের মধ্যে প্রাথমিক মূল্যবোধের সৃষ্টি ও তাকে সামাজিকীকরণ হচ্ছে বিয়ের চতুর্থ উদ্দেশ্য।

সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, চরিত্র গঠন এবং ধর্ম ও কৃষ্টি-কালচারের গোড়াপত্তনে বৈবাহিক জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; যা ছাড়া

---

১৫৬. আল-কামিল লিন নববী, খ. ১, পৃ. ৪৪৯

১৫৭. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৮৭

১৫৮. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১১

১৫৯. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১

১৬০. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৮, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৯. জামে' তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮.

www.amarboi.org

এ বিষয়গুলো অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিয়ষগুলো এমন যে, এর পেছনে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হয়। বিবাহিত হয়ে স্থায়ীভাবে গঠিত পরিবার ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষে যথার্থরূপে এ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্ব পালনে সাবধান হও; যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে (স্বীয় অধিকারের) আবেদন কর এবং রক্তের বাঁধন সম্পর্কেও সচেতনতা অবলম্বন কর।'[১৬১] রক্তের বাঁধন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অর্থ তাদের অপরিহার্য দাবীসমূহ তথা স্ত্রী-পরিজন ও অন্যান্য আত্মীয়দের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

বৈবাহিক জীবন একজন মানুষকে একই সাথে নিজের প্রতি এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখায়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, সন্তানের ভরণ-পোষণসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার পূরণের দায়িত্বভার গ্রহণ, শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের আদর-আপ্যায়ন-এসবই বৈবাহিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া নবাগত প্রত্যেকটি মানবশিশু ফিতরাতে ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নি উপাসনার ধর্মে পরিবর্তন করে নেয়।[১৬২] শিশুকে ইসলামী শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে ফিতরাতে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন পিতা-মাতা ও পরিবারের বয়োঃজেষ্ঠ্য ব্যক্তিগণ। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে তাকে সমাজের একজন সভ্য ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। মহানবী (স.) বলেন, 'পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদেরকে যা প্রদান করে, এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দান হচ্ছে তাদেরকে সুশিক্ষা এবং শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ প্রদান।'[১৬৩] পরিবারে কেবল ছেলে-মেয়ে ও ছোট ভাই-বোনদের যত্ন নেয়া হয় তা নয়; এর বাইরে নিকট আত্মীয় ও দূরবর্তী আত্মীয় প্রতিবেশীদের দায়িত্বও অবস্থাভেদে

---

১৬১. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১

১৬২. মুত্তাফাকুন আলাইহি, সূত্র, মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১

১৬৩. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

www.amarboi.org

পালন করে থাকে। কারণ, ইসলামে পিতা-মাতা ও দুর্বল-অসহায় লোকদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে বারংবার তাগিদ দেয়া হয়েছে।[১৬৪]

আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণও বিবাহিত হয়ে পরিবার গঠনের একটি উদ্দেশ্য। মানুষের পারস্পরিক অধিকারসমূহ কেবল নৈতিকতা, আদর্শ বা কৃষ্টি-কালচারের সাথেই সম্পর্কিত নয়; বরং পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারসমূহ তাতে সংযুক্ত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যখন তোমাদের প্রাচুর্য দেন তখন তা প্রথমেই নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় কর।[১৬৫] পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব আইনত স্বামীর, যদিও স্ত্রী প্রাচুর্যের অধিকারী হয়। আত্মীয় পরিজনের দায়িত্বভারও স্বামীকে বহন করার বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। গরীব আত্মীয় ব্যক্তিরাই তার যাকাত ও অন্যান্য দানের প্রধান দাবীদার। উত্তরাধিকার আইন-বিধানও পারিবারিক কাঠামোর মধ্যস্থিত অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই দায়িত্বগুলোই বিস্তৃত হয় একজন মানুষের উর্ধতন ব্যক্তিবর্গ ও অধঃস্তন বংশধরদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে। কারোর পিতা-মাতা, দাদা-দাদু, নানা-নানুসহ পিতার দিক থেকে ও মাতার দিক থেকে অন্যান্য আত্মীয়রাও তার অর্থ-সম্পদের দাবীদার[১৬৬] একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে বলল, আমার সম্পদ আছে এবং আমার পিতার এগুলো খুব প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাকে বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার অধীন। তোমরা যা অর্জন কর, এর মধ্যে তোমাদের সন্তানরাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম বস্তু। সুতরাং তোমার সন্তানরা যা অর্জন করে তা তোমরা অবশ্যই খাবে, ভোগ-ব্যয় করবে।[১৬৭] কুরআন ও হাদীসে

---

১৬৪. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৬

১৬৫. আল-কুর'আন, ৫৭ ঃ ৭ ও সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০৬

১৬৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৮

১৬৭. *নাইলুল আওতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১৭

www.amarboi.org

চাচা, মামা, ফুফু ও খালাদের অধিকার সম্পর্কেও জোর তাগিদ রয়েছে।[১৬৮] ইয়াতিমদের প্রতি নিজের ছেলে মেয়েদের মত ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবা যত্ন, সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে বরণ করার নির্দেশ রয়েছে। একইভাবে এই দায়িত্বসমূহ বিস্তৃত হয় নাতি-নাতনী ও পতি-পত্নীদের প্রতিও।

পরিবারের সদস্যগণ পরিবারেই একাত্ম হয়ে থাকবে। বয়স্করা ওল্ডহোমে যাবে না এবং ইয়াতিমরা ইয়াতিমখানায় নিক্ষিপ্ত হবে না। গরীব ও বেকার ব্যক্তিটিকে সরকারী সাহায্যে বাঁচার জন্য ঠেলে দেয়া হবে না; বরং এসব সমস্যা প্রধানত পরিবারেই সবচেয়ে মানবিক ও সুচারুরূপে সমাধান হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুভব করে। কারণ কেবল অর্থ-বিত্ত দিয়ে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, যত্নের বেলায় আবেগ বা মনের টান-দরদের ব্যাপারটিও সমান প্রয়োজন।

পারিবারিক পরিধি বিস্তৃত করা এবং সমাজে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি করাও বৈবাহিক জীবনের আরেকটি উদ্দেশ্য। সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে আত্মীয়তার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য উপায়। দু'টি পরিবার, গোত্র বা জাতির মধ্যে বিয়ে সেতুর মত সংযোগ স্থাপন করে এবং অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের গ্রহণ করে নেয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মহানবী (স.) হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরই বনী মুস্তালিক গোত্রের যুদ্ধবন্দীদেরকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কারণ হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) ঐ গোত্রের গোত্রপতির মেয়ে ছিলেন।[১৬৯] বস্তুত বিয়ের এই ভূমিকা ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেমন ছিল ইতিহাস সাক্ষী আজও সারা বিশ্বজুড়ে এর প্রভাব রয়েছে।

---

১৬৮. 'চাচা ওমামা পিতার সমতুল্য' (সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ, ৯০৯) এবং ফুফু ও খালা মায়ের সমতুল্য। (মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৩)

১৬৯. আহমদ খলিল জুম'আহ্, *'নিসাউ আহলিল বাইতি'* (দামেস্ক-বাইরুত : দার-আল ইয়ামামাহ, ১৯৯৬/১৪১৭), পৃ. ৩২৬

www.amarboi.org

সাধনা ও ত্যাগের ধারণা সৃষ্টিতেও বিয়ে অবদান রাখে। বিয়ে পরোক্ষভাবে এও নির্দেশ করে যে, এটি একজন মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ সৃষ্টি, আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন ও জীবন-যাপনে কঠিন সংগ্রাম-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্দেশ্যটি পবিত্র কুর'আনে যেভাবে এসেছে তা হচ্ছে, و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم- ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله – 'আর তোমরা বিয়ে করিয়ে দাও তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদেরকে, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সক্ষম তাদেরকেও। যদি তারা অভাবী হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে (জীবিকা প্রদান করে) সচ্ছল করে দিবেন।'[১৭০] বস্তুত ইসলাম বহুবিধ কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপন বজায় রাখা এবং নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে মানব জাতির অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখা হচ্ছে বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বিয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রত্যেক মানুষের জীবনে বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিয়েহীন জীবন নোঙ্গরহীন নৌকার মত। বিয়ে মানুষের জীবনে একটি সুনির্দিষ্ট গতিধারার সৃষ্টি করে যা জীবন-যৌবন, উদ্যম-উৎসাহ ও নির্ভরশীলতায় একান্ত প্রয়োজন। মানব বংশ সংরক্ষণ ও মানবীয় মূল্যবোধ সৃষ্টিতে যার কোন বিকল্প হয় না। নৈতিক চরিত্রের সংরক্ষণ ও সামাজিক অনাচার-দুরাচার দূরীকরণে এর ভূমিকাই প্রধান। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে শুধু সামাজিক প্রথা বা বিধানই নয়; বরং এটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাতও বটে। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বাণীতে নিজে বিয়ে করা, অন্যদের বিয়ের ব্যবস্থা করা, কারো বিয়ের প্রতিবন্ধক না হওয়া বা বাধা দান থেকে বিরত থাকা, বিয়ের উপকারিতা, বিয়ে থেকে বিরত থাকার কুফল ইত্যাদির বিবরণ দিয়ে বিয়ের আদেশ, উপদেশ ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১৭০. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩২

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদের ছাড়া যে কোন মহিলার সাথে মোহরানার বিনিময়ে বিবাহিত হয়ে জীবন যাপন করা তোমাদের জন্য হালাল করা হল।'[১৭১] মহিলাদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে (সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত) বিয়ে কর।'[১৭২] 'তোমরা নারীদেরকে তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধা দান কর না।'[১৭৩] 'তোমাদের মধ্যে যেসব বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষ অবিবাহিত, তাদেরকে তোমরা বিয়ে করিয়ে দাও।'[১৭৪] 'আর আমি (আল্লাহ্) তাঁদের (নবী-রাসূলগণের) প্রত্যেকের জন্যই স্ত্রী-পুত্র দিয়েছিলাম।'[১৭৫] এই বাণীসমূহের প্রত্যেকটিতে সমাজে বসবাসকারী বিবাহযোগ্য প্রত্যেক নারী-পুরুষকে বিবাহিত জীবনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে মহানবী (স.) বলেছেন, 'মহানবী (স.) এর বাড়িতে কিছুসংখ্যক লোক সমবেত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ ইবাদতের সংকল্প করছিল। তাদের একজন বলল, আমি আমার বাকী জীবন পুরো রাত 'ইবাদতে কাটাব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর রোযা রাখব। একদিনও রোযা ভাঙ্গব না। অপর একজন বলল, আমি মহিলাদেরকে বর্জন করব; কখনও বিয়ে করব না। এরই মধ্যে মহানবী (স.) তাদের কাছে উপস্থিত হন এবং তাদের সংকল্পের কথা শুনে বলেন, তোমরা এই এই করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছ। অথচ জেনে রেখ, আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং আমিই সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। তথাপি আমি রোযা রাখি এবং রোযা ভঙ্গও করি, রাত জেগে নামায পড়ি ও ঘুমাই এবং মহিলাদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলসতা বা গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়া তা বর্জন করে সে আমার

---

১৭১. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৪

১৭২. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩

১৭৩. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩২

১৭৪. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩২

১৭৫. আল-কুর'আন, ১৩ ঃ ৩৮

www.amarboi.org

সুন্নাত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আর যদি কেউ বিয়ের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়।)[১৭৬]

তিনি আরও বলেন, 'বিয়ে আমার সুন্নাত। যে আমার স্বভাবকে ভালবাসে সে যেন আমার সুন্নাতের অনুসরণ করে।'[১৭৭] 'যে পরিবারের ব্যয়ভার বহনের ভয়ে বিয়ে করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয় (পূর্ণাঙ্গ মুমিন নয়)।'[১৭৮] বিয়ের উপকারিতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'হে যুবক-যুবতীগণ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য (দৈহিক ও আর্থিক) আছে, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা, তা দৃষ্টিকে নত করে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর যার আর্থিক সামর্থ্য নেই সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তার যৌন উন্মাদনা দমন করবে।'[১৭৯] তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের কাছে যখন এমন কোন পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান আসে যার দীনদারী ও আমানতদারীতে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তাকে তোমরা বিয়ে করবে। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে অরাজকতা-অস্থিরতা-অশান্তি নেমে আসবে এবং বড় রকমের বিপর্যয় দেখা দিবে।'[১৮০] এ দু'টো হাদীসেই বিয়ে করার উপকারিতা ও না করার কুফল খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। বিয়েহীন জীবন অসম্পূর্ণ। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক দু'দিক দিয়েই। মহানবী (স.) বলেন, 'যে বিয়ে করল সে তার দীনদারীর অর্ধেকের হেফাযত করল। বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহ্কে ভয় করে জীবন যাপন করেন।'[১৮১]

বিয়ের ফসল হচ্ছে সন্তান। মানব বংশের গতিময়তার জন্য এবং পার্থিব

---

১৭৬. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৭-৫৮

১৭৭. হাদীসটি আবু ইয়ালা তাঁর 'মুসনাদে' ইব্‌ন আব্বাস থেকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। সূত্র : *ইয়াহইয়াউ উলূম আল দ্বীন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২

১৭৮. *ইয়াহইয়াউ উলূম আল দ্বীন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২

১৭৯. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫৮

১৮০. *জামে' তিরমিযী*, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮

১৮১. *ইয়াহইয়াউ উলূম আল দ্বীন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২

www.amarboi.org

জীবনের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির জন্য তা যেমন প্রয়োজন তেমনি সন্তান মানুষের মৃত্যুর পরেও তার মুক্তির উপায় হতে পারে। হাদীসে 'যোগ্য-সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করবে' বলে বিয়ের অপরিহার্যতাকেই তোলে ধরা হয়েছে। কারণ যোগ্য-সৎ সন্তান বিয়ে ছাড়া হতে পারে না। অপর এক দীর্ঘ হাদীসে দেখা যায়, এক যুবক সাহাবী নিজেকে মহানবী (স.)-এর সেবায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত করেন। সুযোগ হলে মহানবীর কাছেই ঘুমাতেন। মহানবী (স.) তাকে বললেন, তুমি বিয়ে করবে না ? লোকটি বলল, আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নেই; আমি কেবল আপনারই সেবা করতে চাই। মহানবী (স.) তাকে আবারও একই প্রশ্ন করলেন এবং সে একই উত্তর দিল। এবার লোকটি চিন্তা করল, আমার দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ কিসে নিহিত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে কোনটি সহায়ক, তা মহানবীই ভাল জানেন। তিনি যদি আমাকে আরেকবার বিয়ের কথা বলেন, তবে অবশ্যই্ আমি তা পালন করব। এবার মহানবী (স.) তাকে তৃতীয়বারের মত বললেন, তুমি কি বিয়ে করবে না? তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে বিয়ে করিয়ে দিন।

মহানবী (স.) তাকে বললেন, যাও, ওমুক গোত্রের লোকদের বল যে, তোমাদের বংশের বিবাহযোগ্য কোন মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিতে মহানবী (স.) তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তো কোন সম্পদ নেই। তখন মহানবী (স.) তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, ঐ ব্যক্তির জন্য খেজুর দানার পরিমাণ স্বর্ণ যোগাড় করতে। তাঁরা তাই করল। লোকটি এই পরিমাণ সম্পদ নিয়ে নির্ধারিত গোত্রের সম্প্রদায়ের কাছে গেলে তারা তার কাছে নিজেদের এক মেয়েকে বিয়ে দিল।'[১৮২] এতে বুঝা গেল যে, দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান কোন লোক অবিবাহিত থাকাকে মহানবী (স.) পছন্দ করেননি। বিয়ের প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ পর্যন্ত লোকটিকে বিয়ে করতে সম্মত করালেন। কারণ, মহানবী (স.) জানতেন যে, সে অবিবাহিত থাকলে যে

---

১৮২. প্রাগুক্ত।

www.amarboi.org

কোন সময় তার পদস্খলন ঘটতে পারে এবং পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে তার সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

বিয়ে করলে মানুষের দায়িত্ব জ্ঞান বেড়ে যায়। মানুষ সৃষ্টির আসল রহস্য আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করার সরাসরি সুযোগ তৈরি হয়। স্বামী হিসেবে স্ত্রী-পরিজনের দায়িত্ব বহন এবং স্ত্রী হিসেবে স্বামী-সংসারের প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও একটি সুন্দর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (স.) বলেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে বিয়ে করে এবং বিয়ে করায় সে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্বের হকদার হয়।[১৮৩] বস্তুত, সক্ষম নারী-পুরুষের সার্থক ও সফল জীবনের জন্য বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মুসলিম মনীষীদের সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, বিয়ে বর্জন করে যাবতীয় নফল ইবাদত করার চেয়ে বিয়ে করে পারিবারিক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা সবদিক থেকেই উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ কাজ।[১৮৪] এভাবে বিবাহযোগ্য সক্ষম সব নারী-পুরুষকে বিয়ে করে পবিত্র জীবন লাভের প্রতি ইসলামে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

বিয়েতে কুফু তথা সমতা-সামঞ্জস্যতা রক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম বৈবাহিক জীবনে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। আর এ সম্পর্ক তখনই সম্ভব, যখন একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে জীবন-যাপনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে সমতা ও সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান থাকে। ইসলামের পরিভাষায় এই সমতাকে 'কুফু' বলা হয়। কুফু মানে সমতা, সামঞ্জস্যতা, সাদৃশ্য, অনুরূপ, সমপর্যায় বা সমকক্ষতা।[১৮৫] বিয়েতে বর-কনের সমপর্যায়ের হওয়া, একের সাথে অন্যের সামঞ্জস্য হওয়াকেই কুফু বলা হয়। ইসলাম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে পারফেক্ট ম্যাচ বা যথার্থ জুটির প্রয়োজনের ওপরে জোর দিয়েছে। কারণ, উত্তম দাম্পত্য

---

১৮৩. মুসনাদে আহমদ, পৃ. ২২

১৮৪. ইবন আবেদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার*, (কোয়েটা : আল-মাকতাবা আল-মাজিদিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.), খ. ২, পৃ. ২৮০

১৮৫. আল্লাহ্ বলেন, 'তাঁর সমকক্ষ-সমতুল্য কেউ নেই।' (আল-কুর'আন, ১১২ : ৪)

www.amarboi.org

জীবনের জন্য নারী ও পুরুষ দু'জনের বিশ্বাস, আদর্শ, প্রত্যাশা, আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ের সমতার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত দেখা যায় বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী দম্পতি টেকে না। অর্থাৎ আস্তিক-নাস্তিক, ধনী-গরীব, ইতর-ভদ্র এ রকম বিপরীত অবস্থানের নারী পুরুষ একে অপরকে বিয়ে করে জীবন যাপন করতে শুরু করলেও একটা সময় আসে যখন তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে অসঙ্গতি দেখা দেয়। দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙ্গনের আশঙ্কা বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন, 'খবরদার, কেবল অভিভাবকগণই মেয়েদের বিয়ে দিবে এবং মেয়েরা সমতা ছাড়া বিয়ে করবে না।'[১৮৬]

তিনি আরও বলেছেন, 'হে অভিভাবকগণ! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব কর না; নামাযের সময় হলে, জানাযা উপস্থিত হলে এবং অবিবাহিত ছেলে-মেয়ের যখন কুফু-সমতা পাওয়া যায় তখন তাকে বিয়ে দিতে দেরি কর না।'[১৮৭] সুতরাং কুফু বা সমতার বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা শরী'আতের বিধান। তবে পুরুষের চোখে আদর্শ নারী বা নারীর চোখে আদর্শ পুরুষ কেমন হবে, তা বলে দেয়ার মত সাধারণ কোন মানদণ্ড নেই। কারণ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের মধ্যে এমন দু'জন মানুষও পাওয়া যাবে না, যারা সবদিক থেকে একই রকম। সংস্কৃতে প্রবাদ আছে, 'ভিন্ন রুচিরহ লোক' অর্থাৎ বিভিন্ন লোকের রুচি বিভিন্ন রকম। ফার্সীতেও অনুরূপ প্রবাদ রয়েছে, হার গুলেরা রঙ্গে বূইয়াদ দিগারস্ত'। প্রত্যেক ফুলেরই রং, গন্ধ, স্বাদ আলাদা। সেজন্য নারী-পুরুষের প্রত্যাশা আলাদা হবে এটাই স্বাভাবিক। তারপরও কিছু সাধারণ বিষয় রয়েছে যার মাধ্যমে নর-নারীর পারফেক্ট ম্যাচ বা যথার্থ মিলকরণ সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশনা রয়েছে।

---

১৮৬. হাদীসটি দারা কুতনী' স্বীয় কিতাবের নিকাহ অধ্যায়ে ৩৯২ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম বায়হাকী রহ. 'বাবু ফী ই'তিবারিল কিফায়াতি' খ.৭, পৃ. ১৩৩-এ বর্ণনা করেছেন। সূত্র- জামাল উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ, *'নাসবুর রাইয়াতি'* (গুজরাট : মাজলিস ইলমি, ১৯৮৮), খ. ২ পৃ. ১৮৪

১৮৭. জামাল উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ, *'নাসবুর রাইয়াতি'* (গুজরাট : মাজলিস ইলমি, ১৯৮৮), খ. ২ পৃ. ১৮৪

www.amarboi.org

কুফু বা সমতা নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

মুসলিম মনীষী ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে চারটি বিষয়ে কুফু-সমতা বিবেচিত হবে তথা দীনদারী, আযাদী, বংশ ও শিল্প-পেশা। কেউ কেউ আবার দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও আর্থিক সচ্ছলতাকে কুফুর বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। ফলে কুফু নির্ণয়ের গুণ-বৈশিষ্ট্য বা বিবেচ্য বিষয় হল মোট ছয়টি।[১৮৮]

দীনদারী-বিশ্বাস ও আদর্শের সমতা

বিয়েতে যথাযোগ্য বর-কনে নির্ধারণে ইসলাম সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে দীনদারী তথা সুন্দর চরিত্র ও উদার নৈতিকতার ওপর। এ প্রসঙ্গে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন, সমতা, যা বিশেষজ্ঞগণের নিকট সর্বসম্মতভাবে গৃহীত তা হল দীন পালনের ব্যাপার। কাজেই কোন মুসলিম মেয়ের জন্য কাফিরের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়।[১৮৯] অনুরূপভাবে ব্যভিচারী পুরুষ ঈমানদার নারীর জন্য এবং ব্যভিচারী নারী ঈমানদার পুরুষের জন্য কুফু নয়। ঈমানদার নারী-পুরুষের সাথে ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ককে ইসলামে হারাম করা হয়েছে।[১৯০] কারণ, মুমিন নারী-পুরুষ কখনই ফাসিক-পাপাচারী নারী-পুরুষের সমান হতে পারে না।[১৯১] স্বভাব-চরিত্র ও বাস্তব কাজের দিক দিয়ে এ দু'শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ দু'য়ের মধ্যে মনের মিল হওয়া, চরিত্র ও স্বভাবের ঐক্য হওয়া, হৃদয়ের সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া, নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং হৃদয়ের শান্তি ও স্বস্তি লাভ যা বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য কখনও সম্ভব হবে না। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, দুশ্চরিত্র নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য

---

১৮৮. আবু সুলাইম হামাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল খাত্তাবী, *মা'আলিমুস সুনান*, (বাইরুত : আল মাকতাবা ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১/১৪০১), খ. ৩, পৃ. ২০৭

১৮৯. বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবন আহমদ আইনী, *উমদাতুল ক্বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৮৩

১৯০. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩

১৯১. আল-কুর'আন, ৩২ : ১৮

www.amarboi.org

এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ রা দুশ্চরিত্র নারীদের জন্য এবং সচ্চরিত্র নারীগণ সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষগণ সচ্চরিত্র নারীকুলের জন্য।'[১৯২] অর্থাৎ নেককার পুরুষ কেবল নেককার নারীকেই গ্রহণ করবে, বদকার ও চরিত্রহীনা নারী নয়। কেননা তা তার জন্য কুফু নয়। এমনিভাবে কোন নেককার চরিত্রবতী নারীকে বদকার চরিত্রহীন পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা তা তার জন্য কুফু-সমতা নয়।

বস্তুত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বর-কনের কুফু বা সমতা বিচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাদের দীনদারী। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বাণীতে মানুষের মান-মর্যাদা ও সম্মান নির্ধারণে তাকওয়া ও দীনদারীকেই মূলভিত্তি বা মানদণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯৩] সুতরাং মানুষে মানুষে তাকওয়া-পরহেজগারী, দীনদারী ও নৈতিক চরিত্র ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়েই পার্থক্য করা উচিত নয়। তাই বিয়ে-শাদীতে বর-কনের কুফু নির্ধারণে দীনদারীর গুণটিকেই সর্বপ্রথম বিবেচনায় রাখতে মহানবী (স.) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, চারটি কারণে কোন মহিলাকে বিয়ে করা হয়ে থাকে; তার ধন-সম্পদ থাকার কারণে, তার বংশ মর্যাদা থাকার কারণে, রূপ-সৌন্দর্যের কারণে এবং দীনদারীর কারণে। তবে তুমি দীনদার মেয়েকেই বিয়ে করে ধন্য হও।'[১৯৪] হাদীসে উল্লেখিত চারটি গুণই স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি গুণই এমন যে, এর যে কোন একটির জন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করা যেতে পারে।

ইমাম বায়যাভী (রহ.) বলেন, মানুষের অভ্যাস হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে এ চারটির যে কোন একটি থাকলেই তাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করার জন্য উৎসাহিত ও আগ্রাহান্বিত হয়।[১৯৫] কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এই চারটি গুণের

---

১৯২. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ২৬

১৯৩. আল-কুর'আন, ৪৯ ঃ ১৩

১৯৪. *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬২

১৯৫. আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ, *তাফসীর আল-বায়যাভী*, (বাইরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮/১৪০৮), খ. ১, পৃ. ৬৭

www.amarboi.org

মধ্যে চতুর্থ গুণ তথা দীনদারী হচ্ছে সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের চরিত্রই আসল সম্পদ। কোন মানুষের দীনদারী-চরিত্র-সতীত্ব নষ্ট হলে তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দীনদারী ছাড়া অন্যান্য গুণগুলো যেমন উপকারী হতে পারে তেমনি অপকারী ও অকল্যাণের কারণও হয়ে ওঠতে পারে। মহানবী (স.) এর একটি হাদীসে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। 'তোমরা কেবল রূপ-সৌন্দর্য দেখেই নারীদের বিয়ে কর না। কারণ, রূপ-সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপথগামীও করে দিতে পারে। আর তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে কর না। কারণ ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও অবাধ্য করে দিতে পারে। তোমরা নারীদের দীনদারী দেখে বিয়ে কর। মনে রেখ, কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দীনদার হয় তবু সে অন্যদের তুলনায় উত্তম। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমরা নারীদের কেবল তাদের সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে কর না। কেননা এ রূপ-সৌন্দর্যই অনেক সময় তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের লোভেও বিয়ে কর না, কারণ এ ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও অনমনীয় বানাতে পারে; বরং তাদের দীনদারীর গুণ দেখেই বিয়ে করবে। বস্তুত, একজন কৃষ্ণাঙ্গ দীনদার দাসীও পারিবারিক শান্তির জন্য অনেক ভাল হয়ে থাকে।'[১৯৬]

এসব হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সমপর্যায়ের দীনদার লোকদের সাহচর্য অতি উত্তম। কেননা, দীনদার লোকদের সঙ্গী-সাথীগণ তাদের চরিত্র, উত্তম গুণাবলী, বরকত-কল্যাণ ও রীতি-নীতি থেকে উপকৃত হতে পারে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে স্ত্রী দীনদার হওয়া একান্ত অপরিহার্য এবং এদিক দিয়ে সে ভাল সেই উত্তম। কেননা, সে তার শয্যাশায়িনী, সে তার সন্তানের জননী, সে তার ধন-সম্পদ, ঘরবাড়ী ও তার (স্ত্রীর) নিজের রক্ষণাবেক্ষণের একমাত্র দায়িত্বশীল ও আমানতদার

---

১৯৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ, *সুনান ইবন মাজাহ*, (কলকাতা : এম বশির হাসান এন্ড সন্স, তা. বি.), পৃ. ১৩৫

www.amarboi.org

ব্যক্তি।'[১৯৭] অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'দুনিয়ার সবকিছুই সম্পদ। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে নেক চরিত্রের নারী।'[১৯৮] আর নেক চরিত্রের নারী বলতে বুঝায় যে তার স্বামীর জন্য সর্বাবস্থায় কল্যাণকামী, তার ঘরের রাণী এবং তার আদেশানুগামী।[১৯৯]

বস্তুত, দীনদারী ছাড়া কোন গুণই এমন নয় যার দরুন কোন লোক অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হতে পারে। একথা যেমন নারীদের ব্যাপারে সত্য, তেমনি পুরুষের ক্ষেত্রেও তা অনুরূপ গুরুত্বসহকারে প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে রাদ্দুল মুখতার গ্রন্থে ফিকহবিদদের সর্বসম্মত মত উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'নারী স্বামী গ্রহণ করবে তার উত্তম দীনদারী ও উদার চরিত্রের জন্য এবং সে কখনও ফাসিক-পাপাচারী ও ধর্মহীন ব্যক্তিকে বিয়ে করবে না।'[২০০] আল্লাহ্ তা'আলা সাহচর্য গ্রহণের সার্বজনীন নীতি ঘোষণা করে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও।'[২০১]

এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। মনে রাখা আবশ্যক যে, নৈতিক চরিত্র ও দীনদারী ছাড়া বংশ মর্যাদা, ধন-সম্পদ ও রূপ সৌন্দর্য দাম্পত্য জীবনে অশান্তি বয়ে আনতে পারে। তাই মহানবী (স.) বলেন, 'যখন তোমাদের কাছে বিয়ের জন্য কোন ছেলে বা মেয়ের প্রস্তাব আসে, যার দীনদারী ও স্বভার-চরিত্র তোমরা পছন্দ কর তবে তাকেই বিয়ের উপযুক্ত বর বা কনে

---

১৯৭. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সুবুলুস সালাম*, (দারুল হাদীস আল কাহিরা, ১৯৯৭ খ্রী.), খ. ৩, পৃ. ১০৯

১৯৮. আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুআইব, *সুনান নাসাঈ*, (দেওবন্দ : মাকতাবা থানবী, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৭১

১৯৯. বুলূগুল আমানী, সূত্র. *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

২০০. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার, (কোয়েটা : আল-মাকতাবা আল মাজিদিয়্যাহ, ১৩৯৯হি.)

২০১. আল-কুর'আন, ৯ ঃ ১১৯

www.amarboi.org

হিসেবে গ্রহণ কর। যদি এমনটি না কর তবে বড় রকমের ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'যখন তোমাদের কাছে এমন ছেলে বা মেয়ের প্রস্তাব আসে যাদের দীনদারী ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে তোমরা পছন্দ কর, তবে তাকেই তোমরা বিয়ে কর।[২০২] ইমাম মালিক (রহ.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, কেবলমাত্র দীনদারীর দিক দিয়েই কুফু বিচার করতে হবে; অন্য কোন দিক দিয়ে নয়।[২০৩]

কেফায়েতে নসবী বা বংশীয় সমতা

বিয়েতে বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে বর-কনের মধ্যে কুফু বিবেচিত হবে। যেমন কুরাইশ বংশীয় লোক কুরাইশদের জন্য কুফু। আরবদের অন্যান্য বংশের লোক কুরাইশদের কুফু হবে না। অবশ্য তারা নিজেরা একে অপরের কুফু হবে। অর্থাৎ কুরাইশ বংশ ছাড়া সমস্ত আরব পরস্পরের কুফু। আর যারা মাওয়ালী-অনারব তারা আরবদের কুফু হবে না। অবশ্য বিভিন্ন মাওয়ালী পরস্পরের কুফু।[২০৪] এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) এর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, কুরাইশগণ একে অপরের জন্য সমান মর্যাদার। এক বাতান বা ছোবা অন্য বাতান বা ছোবার সমকক্ষ। আরবগণ একে অপরের সমান মর্যাদার। তাদের এক গোত্র অন্য গোত্রের সমকক্ষ। অনারব মুসলিমরা একে অপরের জন্য সমান মর্যাদার। যে কোন ব্যক্তি অন্য যে কোন ব্যক্তির জন্য কুফু হতে পারে।[২০৫] এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, বংশ মর্যাদার সমতার ব্যাপারটি শুধু আরবদের জন্যই নির্ধারিত। অনারব

---

২০২. জামে' তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৫

২০৩. ইমাম শাওকানী, নাইলুল আওতার, খ. ১, পৃ. ২৬২

২০৪. ফতোয়ায়ে আলমগিরী, (সম্পাদনায়, এম এন এম. ইমদাদুল্লাহ, ই. ফা. বা.), খ. ২, পৃ. ৬০৩

২০৫. হাকেম ও দারা কুতনী হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবন ওমর থেকে মারফু' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সূত্র. জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ, *নাসাবুর রাইয়াতি লিআহাদীসিল হিদায়াহ্.* (সিমলাক : মাজলিস ইলমী, ১৯৮৮), খ. ৩, পৃ. ১৯৮

www.amarboi.org

মুসলিমদের জন্য বংশের সমতা প্রযোজ্য নয়। কারণ, অনারবগণ তাদের বংশীয় মর্যাদা নষ্ট করে ফেলেছে। নসব বা বংশের সংরক্ষণ অনারবদের মধ্যে অনুপস্থিত। সুতরাং যে কোন পুরুষ অন্য যে কোন নারীকে বিয়ে করতে কোন বাধা নেই। অনারব মুসলিমদের জন্য এক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে সমতা। অর্থাৎ কে কত পুরুষ পর্যন্ত মুসলিম-এর ভিত্তিতে কুফু বা সমতা নির্ধারিত হবে। যে ব্যক্তির বাপ-দাদা মুসলিম সে ঐ নারীর কুফু হবে যার বাপ-দাদা-পরদাদাও মুসলিম ছিলেন। আর যে ব্যক্তি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে কুফু হবে না তার, যার পিতা মুসলিম ছিল। আর যার পিতা মুসলিম সে তার কুফু হবে না, যার বাপ-দাদা উভয়েই মুসলিম। কারণ বাপ ও দাদা এই দুই পুরুষেই নসব বা বংশ পূর্ণতা লাভ করে।[২০৬]

নসব সম্পর্কে বর্ণিত বিধানটি হচ্ছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের। যথাস্থানে তা কার্যকর থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। তবে, আরব জাহানের বাইরের সারা পৃথিবীর মুসলিমদের বিয়ের সময়ও পাত্র-পাত্রীর বংশ মর্যাদার সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা, মানুষের মনে বংশ গৌরবের অহমিকা তার আজন্মের স্বভাব। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব-অহংকার হয়ে থাকে। উঁচু বংশ মর্যাদাসম্পন্ন নারী নীচ-হীন বংশের পুরুষের অধীনে থাকতে ঘৃণাবোধ করে। এতে স্বামী শিক্ষা-দীক্ষায় যতই যোগ্য হোক না কেন বংশ মর্যাদায় স্ত্রীর তুলনায় নীচু বলে সর্বদাই তার মনে দুর্বলতা ও অস্বস্তি বিরাজ করতে থাকে।

তদুপরি স্ত্রী যদি অহংকারী হয় তবে তো আর কোন কথাই নেই। স্ত্রী তখন স্বামীকে নিজ বংশ অহংকারে পাত্তাই দিতে চায় না। সে তখন স্বামীর সামনে এক দুর্দান্ত মনিবের ভূমিকায় অভিনয়ে রত হয়। অনুরূপভাবে উঁচু বংশীয় পাত্র তার নীচ বংশীয় স্ত্রীকে কোনভাবেই সমশ্রেণীর বলে মনে করে

---

২০৬. বুরহান উদ্দীন আল মুরগিনানী, *হেদায়াহ,* (দিল্লী : আল মাকতাবা আল মুজতাবাঈ, ১৩৩৩ হি.), খ. ২, পৃ, ৩০০

www.amarboi.org

না। সর্বদাই তাকে নিজ থেকে ক্ষুদ্র ভাবে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীও তার কাছে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে চলতে থাকে। এতে দুজনের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি হয় না। বিশেষ করে স্বামীর মা-বোনেরা যখন বউকে ছোট জাতের মেয়ে বলে কথায় কথায় খোটা দেয়, তখন তার আর দুঃখের সীমা থাকে না। বস্তুত, সমবংশীয় বা সমগোত্রীয় না হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি হতে পারে; যা বৈবাহিক জীবনে অশান্তি ডেকে আনবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'কিতাবুল আসার' নামক গ্রন্থে হযরত ফারুকে আযমের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারি করে দিব যে, যেন কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন বংশের পরিবারে বিয়ে দেয়া না হয়।

স্বাধীনতা

গোলাম বা দাসী-বাঁদী কোন স্বাধীন নারী পুরুষের কুফু হতে পারে না। কারণ পরাধীনতায় কুফরীর ছাপ থেকে যায়। এতে হীনতা, নীচতা, অপমান ও লাঞ্ছনা বিদ্যমান। কাজেই সমতা বিচারে এটি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

অর্থ-সম্পদ

অর্থ-সম্পদের দিক দিয়েও সমতা রক্ষা করা বিবেচ্য বিষয়। আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি শুধুমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়; কোন নারীর জন্য তা বিবেচ্য নয়।[২০৭] যে পুরুষের মহরে মু'আজ্জাল-তাৎক্ষণিক মহর ও ভরণ-পোষণ দেয়ার মত অর্থ-সম্পদ নেই, সে কোন দরিদ্র নারীরও কুফু হতে পারে না। বাহ্যত মনে হতে পারে যে, দরিদ্র পুরুষ এবং দরিদ্র নারী সমান সমান। তাই এরা পরস্পর কুফু হবে। বস্তুত তারা একে অন্যের কুফু হতে পারে না। কারণ মোহরানা এবং ভরণ-পোষণ দেয়ার মত আর্থিক সামর্থ্য থাকা পুরুষের জন্য অপরিহার্য। অপরদিকে দরিদ্র নারীও মোহরানা

---

২০৭. হেদায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

www.amarboi.org

ও ভরণ-পোষণের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারিণী।[২০৮] আর যে ব্যক্তি মোহরানা ও ভরণ-পোষণ দিতে সক্ষম সে ব্যক্তি ধনী নারীরও কুফু হবে। নারী পাহাড় পরিমাণ সম্পদের অধিকারিণী হলেও ন্যায়সঙ্গত মোহরানা ও ভরণ-পোষণ দিতে সক্ষম ব্যক্তির কুফু বলে বিবেচিত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহরানা আদায় করার সামর্থ্য রাখে এবং প্রতিদিন এই পরিমাণ আয় করে যে, তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট হবে; তবে সে কুফু হবে এবং এটাই শুদ্ধ। কোন চাকুরিজীবীর জন্য ইমাম আবু ইউসুফের এ অভিমতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, বিরাট প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিকারী কোন নারীর কুফু হওয়ার জন্য শুধুমাত্র মোহরানা ও ভরণ-পোষণ দিতে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তাকেও ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে হবে। কারণ মানুষ প্রাচুর্যের অহংকারে বিভোর থাকে এবং দরিদ্রকে ঘৃণা ও উপহাস করে।[২০৯] বস্তুত মোহরানা এবং ভরণ-পোষণ যা আদায় করা পুরুষের জন্য ওয়াজিব, অন্ততপক্ষে এই পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক না হলে কোন পুরুষ ধনী কিংবা গরীব কোন নারীরই কুফু বলে গণ্য হবে না।

স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য তৈরি হয় সম্পদের দ্বারা। পৃথিবীতে সম্পদশালী মানুষের ওজন ও মর্যাদা সম্পদহীন ব্যক্তির চেয়ে সবসময়ই বেশী হয়ে থাকে। মহানবী (স.) বলেন, 'পৃথিবীবাসীদের মান-সম্মান ও গৌরব যা দিয়ে নির্ধারিত হয়, তা হল সম্পদ।'[২১০]

পেশা

পেশার দিক দিয়েও সমতা বিবেচিত ও নির্ধারিত হবে। পেশার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আচরণ অধিক সংশ্লিষ্ট থাকে। পেশার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও

---

২০৮. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৪

২০৯. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

২১০. সুনান নাসাঈ, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০

www.amarboi.org

আভিজাত্য নিয়ে মানুষ পরস্পর গর্ব-অহংকার করে থাকে এবং পেশার হীনতা, নীচতায়ও মানুষ সমভাবে ঘৃণিত, লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করে।[২১১] উল্লেখ্য যে, পেশার সমতা বলতে বর-কনে বা তাদের পরিবার এক ও অভিন্ন পেশার হতে হবে, তা নয়; বরং সমমানের বা সমপর্যায়ের যে কোন পেশার অধিকারী হওয়াকে পেশা'র সমতা বলা হয়। দেশকাল পাত্র ভেদে পেশার মর্যাদা কম-বেশি হতে পারে। তবে আধুনিক রুচিশীল ও সম্মানজনক সব পেশাই সমমর্যাদার ও সমমানের বলে বিবেচিত । যেমন, প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিক্ষক, সরকারী-বেসরকারী চাকুরিজীবি, সামরিক বাহিনীর সদস্য, বিদেশী ইমিগ্রেন্ট, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কলামিষ্ট, লেখক, গবেষক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক কৃষিবিদ, শিল্পপতি প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ প্রায় সমমানের ও সমগোত্রের। সুতরাং তারা সবাই পরস্পরের কুফু বলে বিবেচিত হবে।

আকল-বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান

আকল-বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কুফু বিবেচ্য বিষয় হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে কুফু বিবেচ্য নয়।[২১২] কারো মতে, বিয়েতে বর-কনের জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষা-দীক্ষার সমতাও বিবেচনায় রাখা জরুরী। একজন উচ্চ শিক্ষিত পাত্রের সাথে মূর্খ পাত্রীর বিয়ে দিলে পাত্রের জন্য তা এক দুঃসহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অযোগ্য স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে তার বিবেকে বাধে কিন্তু মনের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ রিক্ত এবং নিঃস্ব হয়ে নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করে অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকে। অন্যদিকে একজন সুশিক্ষিত পাত্রীকে যদি একজন মূর্খ বোকা অপদার্থ স্বামীর হাতে তুলে দেয়া হয় তবে তার অবস্থাও

---

২১১. হেদায়াহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০৭

২১২. ফতোয়ায়ে আলমগিরী, সম্পাদনায়, এম এন এম. ইমদাদুল্লাহ, (বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ১৯৯৬), খ. ২, পৃ. ৬০৭

www.amarboi.org

ঠিক উপরোক্ত শিক্ষিত স্বামীর ন্যায় ঘটে থাকে।[২১৩] শিক্ষিত, জ্ঞানী-বুদ্ধিমান কখনই অশিক্ষিত-মূর্খ লোকের সমান নয়।[২১৪] সাধারণত দেখা যায়, বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী দম্পতি টেকে না অর্থাৎ ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এরকম বিপরীত অবস্থানের নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর বাধলেও একটা সময় আসে যখন তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে অসঙ্গতি দেখা দেয়। দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরার আশঙ্কা বাড়ে। সুতরাং জ্ঞান-বুদ্ধিতেও কুফু বিবেচ্য হওয়া উচিত।

রূপ-সৌন্দর্য

রূপ-সৌন্দর্য ও লাবণ্যের দিক দিয়ে কুফু-সমতার বিষয়টি বিবেচ্য নয়।[২১৫] কারণ মানুষের দৈহিক গঠনাকৃতি, সুন্দর-অসুন্দর, ফর্সা-কালো ইত্যাদি সবই প্রকৃতির নিয়মে হয়ে থাকে। দেশ-কাল-স্থান ও জল-বায়ুর প্রভাবও এক্ষেত্রে কম নয়। সর্বোপরি স্বয়ং স্রষ্টাই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা আকৃতি দেন[২১৬] এবং এই আকৃতিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, আকর্ষণীয়, লাবণ্যময়, মোহনীয় ও দৃষ্টিনন্দন করে থাকেন।[২১৭] বস্তুত, মানবজাতির গঠন আকৃতি ও দৈহিক সৌন্দর্য গোটা সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টজীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুষম।[২১৮]

বয়সের সমতা

বর-কনের মধ্যে বয়সের সমতা থাকাও জরুরী। অধিক বয়সের ছেলের সাথে অল্প বয়সী মেয়ের বিয়ে দেয়া মেয়ের প্রতি অবিচারেরই শামিল। এমনিভাবে অধিক বয়সের মহিলার বিয়ে অল্প বয়সের কোন ছেলের সাথে

---

২১৩. আফসারুল হুদা, দাম্পত্য জীবন, পৃ. ১১৫

২১৪. আল-কুর'আন, ৩৯ ঃ ৯

২১৫. ফতোয়ায়ে আলমগিরী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০৭

২১৬. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ৬

২১৭. আল-কুর'আন, ৬৪ ঃ ৩

২১৮. আল-কুর'আন, ৯৫ ঃ ৪

www.amarboi.org

হওয়াও সংগত নয়। এরূপ বিয়ে যদিও শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়, তবুও অন্ততপক্ষে অপছন্দনীয় অবশ্যই। বর-কনের বয়সের মধ্যে মিল থাকলে উভয়ের মধ্যে যে অধিকতর সমঝোতা হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়টি শুধু স্বভাবেরই দাবী নয়; শরী'আতেও এর সমর্থন ও গুরুত্ব রয়েছে। জান্নাতী রমণীদের উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমি তাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, স্বামী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।'[২১৯] মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) এর বিয়ে প্রসঙ্গটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ফাতিমা (রা.) বিবাহযোগ্য হলে প্রথমে আবূ বকর (রা.), পরে ওমর (রা.) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। তাদের উভয়ের প্রস্তাবের উত্তরে মহানবী (স.) বলেন, তার বয়স অতি অল্প। অতঃপর আলী (রা.) ফাতিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন এবং মহানবী (স.) তার প্রস্তাবে রাযী হয়ে ফাতিমাকে তাঁর সাথেই বিয়ে দেন।[২২০]

মোটকথা, বর-কনের বয়সের পার্থক্য বেশী হলে উভয়ের সম্পর্কের মাঝে বয়সের একটি আড়াল থেকে যায়। কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাঝে যে সরল সম্পর্ক বিরাজ করে বয়স্কদের সাথে তাদের সে সম্পর্ক হয় না। হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অধিক বয়সী পুরুষ । মহানবী (স.) বর-কনের বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানালেন এবং কাছাকাছি বয়সের বর হযরত আলী (রা.) সাথে ফাতিমার বিয়ে দিলেন। এতে বুঝা গেল, বর-কনের মধ্যে বয়সের সমতা থাকা বা কাছাকাছি বয়সের হওয়া বিয়েতে অবশ্যই জরুরী বিষয়। কারণ হৃদয়ের টান ও মনের মিল ও গভীর ভালবাসা সৃষ্টিতে এটি খুব বেশি সহায়ক।[২২১] উল্লেখ্য যে বিয়ের সময় হযরত আলীর বয়স ছিল একুশ বছর এবং হযরত ফাতিমার বয়স ছিল পনের বছর। তাই বর-কনের বয়সের

---

২১৯. আল-কুর'আন, ৫৬ : ৩৫-৩৭

২২০. সুনান নাসাঈ, অধ্যায়, 'মেয়ের বিয়ে তার সমবয়সী ছেলের সাথে দান' খ. ২, পৃ. ৬৯

২২১. হাশিয়া, সুনান নাসাঈ, অধ্যায়, 'মেয়ের বিয়ে তার সমবয়সী ছেলের সাথে দান' খ. ২, পৃ. ৬৯

www.amarboi.org

মাঝে খুব বেশি পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তবে কনে অপেক্ষা বর কিছু বড় হওয়াই সঙ্গত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর বয়স কিছুটা ছোট হওয়া সমীচীন।

বস্তুত, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করা শরী'আতে বিশেষভাবে কাম্য। ধর্মীয়-দীনদারীর সমতা অপরিহার্য। কোন কাফিরের সাথে কোন মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ-হারাম; যদিও মেয়ে এতে সম্মত থাকে। কেননা, এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, তা শুধু তার সম্মতির কারণেই রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ্‌র হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত ফরয-অবশ্য পালনীয় নির্দেশ।[২২২] পক্ষান্তরে বংশগত, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার বিষয়টি এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা এগুলো হল মেয়ে এবং তার অভিভাবকদের অধিকার।

যদি কোন বিবেকসম্পন্ন বয়স্কা মেয়ে ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বে কোন দরিদ্র ছেলের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে তবে তা করার অধিকার তার রয়েছে। এমনিভাবে কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোন মেয়ে বা অভিভাবকবৃন্দ বংশগত সমতার দাবী পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি হয়ে যায়, যা বংশগতভাবে তাদের চেয়ে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কোন কল্যাণের দিক চিন্তা করে এরূপ করা যেতে পারে।[২২৩] তবে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধানে যত বেশি কাছাকাছি হওয়া যাবে পারিবারিক জীবন ততবেশি শান্তি ও সুখের হবে। কারণ, Marriage is a most intimate communion and the mystery of sex finds its highest fulfillment when intimate.[224]

---

২২২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২১

২২৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনু. ও সম্পাদনা, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন*, (খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি), পৃ. ১০৮২

২২৪. A Yusuf Ali. The Glorious Quran. p. 87, F.no. ২৪৬.

www.amarboi.org

প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর তাদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অভিভাবকগণের দায়িত্বের সীমা-পরিসীমা

প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে অভিভাবকের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া নিজের বিয়ে নিজে সম্পন্ন করলে ইসলামী আইনবিদগণের সর্বসম্মত মত হচ্ছে তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী মেয়ে অভিভাবকের অসম্মতিতে নিজের বিয়ে নিজের পছন্দে সম্পন্ন করলে তা শুদ্ধ হবে কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফেয়ী', আহমদ ও ইবন আবী লাইলা (রহ.) বলেন, প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী মেয়ের বিয়ে তার অনুমতি ছাড়াও শুদ্ধ হবে। শুধু অভিভাবকের অনুমতিতেই তা হতে পারে। যেহেতু স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা মেয়ে নিজের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে বেশি অধীকারী সেহেতু বিপরীত নিয়ম অনুযায়ী বুঝা যায় যে, প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী মেয়ের ব্যাপারে অভিভাবক অধিক হকদার হবে অর্থাৎ অভিভাবক যদি এরূপ মেয়ের বিয়ে তার সম্মতি ছাড়া জোর করে দিয়ে দেয় তবে তা সঠিক ও কার্যকর হবে।[২২৫]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম আওযায়ী' (রহ.) এর মতে প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী মেয়ের ওপর জোরপূর্বক বিয়ে দেয়ার কোন অধিকার অভিভাবকের নেই। 'প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী মেয়েকে বিয়েতে জোর করা বা অভিভাবকত্ব খাটিয়ে জোর করে বিয়ে দেয়া অভিভাবকের জন্য বৈধ নয়।'[২২৬] অর্থাৎ মেয়ের সরাসরি অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হবে না। বর নির্বাচন ও বিয়ের আক্‌দ সম্পাদনে মেয়ের মতামত ও অনুমতিই মূখ্য ও চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে তার সহায়ক শক্তি হিসেবে বুদ্ধি-পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবেন। যদি মেয়ে ও অভিভাবকের মতের অমিল দেখা দেয়, বা মেয়ের পছন্দে অভিভাবকের সম্মতি-সন্তুষ্টি না থাকে এমতাবস্থায় মেয়ে নিজের মতে ও পছন্দে কোন

---

২২৫. বিস্তারিত দ্র. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২১, ২৪ ঃ ৩২ এর অনুবাদ ও তাফসীরসমূহ

২২৬. বুরহানুদ্দীন আল-মুরগিনানী, *হেদায়া*, খ. ২, পৃ. ২৯৪

www.amarboi.org

ছেলেকে বিয়ে করে ফেলে তবে তার বিয়ে সঠিক ও বিধিসম্মত হবে। 'প্রাপ্ত বয়স্কা সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্না স্বাধীন মেয়ের বিয়ে তার সম্মতি ও অনুমতিতেই সম্পন্ন হয়ে যায় যদিও অভিভাবক তাতে অসম্মত হয়। মেয়ে কুমারী, স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা যা-ই হোক না কেন।'[২২৭]

তবে এ ব্যাপারে অভিভাবকের ভূমিকা বা অধিকারকে খাটো করা কোন মেয়ের জন্যই উচিত নয়। কারণ, অভিভাবক তথা পিতা-মাতা সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি দরদী ও কল্যাণকামী। ভবিষ্যতের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে তার অপরিপক্ক জ্ঞান-বুদ্ধির তুলনায় অভিভাবকের সুচিন্তিত মতামতের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। কুরআন ও হাদীসের বাণীসমূহে সন্তানের বিয়ে দেয়ার যে গুরু দায়িত্ব নীতিগতভাবে অভিভাবকের ওপর ন্যস্ত হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালনের সুযোগ দেয়া সন্তানের কর্তব্য। আর অভিভাবকের কর্তব্য হচ্ছে, ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার স্পষ্ট মতামত জেনে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার অপরিহার্য শর্তসমূহ

মুসলিম আইনে বিয়ে শুদ্ধ হওয়া ও নারী পুরুষ একে অপরের জন্য বৈধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। এ শর্ত পূরণ করে যে কোন নারী পুরুষ আল্লাহ্‌র মধ্যস্থতায় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এ শর্তগুলো হচ্ছে দেন মহর নির্ধারণ, বর-কনের সম্মতি তথা ইজাব-প্রস্তাব ও কবুল-সমর্থন বা গ্রহণ এবং দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি। প্রথম শর্তটি শুধু বরের সাথে সংশ্লিষ্ট-স্বামীর করণীয়-কর্তব্য, দ্বিতীয়টি বর-কনে দু'জনের সাথেই সম্পৃক্ত এবং তৃতীয়টি বর-কনে কারোরই কাজ নয়; বরং তাদের পরিবারের ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের কাজ।

(ক) দেন-মহর বা মোহরানা

স্ত্রীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান, তার আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান ও

২২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

www.amarboi.org

তার ওপর বরের স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে ইসলামী বিধানে স্ত্রীকে মোহ্‌রানা প্রদান স্বামীর ওপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। বৈবাহিক চুক্তির ভিত্তিতে কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের বিনিময় হিসেবে যা প্রদান করা হয়, তাই হচ্ছে দেন-মহর বা মোহ্‌রানা।[২২৮]

দেন মহর বা মোহ্‌রানার গুরুত্ব

বিয়েতে মোহ্‌রানা দেয়া ফরয। ইসলামে এটি অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়। বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য শর্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'এদের (যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম) ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারীকে বিয়ে করা হালাল করা হয়েছে। শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে গ্রহণ করবে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য; ব্যভিচারের জন্য নয়। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যাকে তোমরা ভোগ করবে তার বিনিময়ে তাদের মোহ্‌রানা ফরয মনে করে আদায় কর।[২২৯] এমনকি দাসীকে তার মালিকের অনুমতি নিয়ে, আহলে কিতাবদের সতী-সাধ্বী মেয়েকে এবং কাফির-মুশরিকদের বিয়ে করা স্ত্রী যখন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম সমাজে চলে আসে, তাদেরকে যখন কোন মুসলিম পুরুষ বিয়ে করবে তখন তাকে মোহ্‌রানা দিয়েই বিয়ে করতে হবে।[২৩০]

মোহ্‌রানা স্ত্রীর অধিকার। বিয়ের আক্‌দ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ই মোহ্‌রানা নির্ধারণ ও এর পরিমাণ ঠিক করা একান্ত কর্তব্য। যদি কেউ মোহ্‌রানা নির্ধারণ না করে বিয়ে করে, তবে বিয়ে হয়ে যাবে বটে; কিন্তু মোহ্‌রানা দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বর-কনে বা তাদের অভিভাবকগণ মিলে মোহ্‌রানার পরিমাণ ঠিক করে নিবে অথবা মহরে মিছাল তথা কনের পরিবারের অন্যান্য মহিলা যেমন বোন, ফুফুদের মোহ্‌রানার সমপরিমাণ মোহ্‌রানা

---

২২৮. আল মু'জাম আল ওয়াসীত, প্রাগুক্ত।

২২৯. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৪

২৩০. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৫, ৫ ঃ ৫, ৬০ ঃ ১০

www.amarboi.org

নির্ধারিত হবে। কারণ, মোহরানা ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। এমনকি যদি কেউ মোহরানা না দেয়ার কথা উল্লেখ করে বিয়ে করে, তবুও তার ওপর মোহরানা দেয়া ওয়াজিব হবে। তাকে মোহরানা অবশ্যই আদায় করতে হবে। মহানবী (স.) বলেন, 'বিয়ের সময় অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ নিজের জন্য হালাল মনে করে থাক।[২৩১]

বিয়ের পর স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা স্বামীর প্রধান কর্তব্য। এমনকি মোহরানা পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্বামী থেকে নিজেকে দূরে রাখার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। মহানবী (স.) মোহরানার কিছু না কিছু অংশ স্ত্রীর হাতে না দিয়ে তার নিকট গমন করতে নিষেধ করেছেন।[২৩২] তবে এ নিষেধ বাণীটি ছিল সৌজন্যমূলক। তাই মোহরানা নগদ আদায় না করলেও স্বামী-স্ত্রীর মিলন অবৈধ হবে না। তবে মুস্তাহাব হচ্ছে কিছু না কিছু মিলনের পূর্বেই আদায় করা। মালিক ইব্ন আনাস (রা.) বলেন, স্ত্রীকে তার মোহরানার কিছু না কিছু না দিয়ে স্বামী যেন তার নিকট গমন না করে। এর ন্যূনতম পরিমাণ হল এক দীনারের এক চতুর্থাংশ কিংবা তিন দিরহাম। মোহরানার নির্ধারিত হোক বা না-ই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।[২৩৩]

বরের আর্থিক ও পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যায়সঙ্গত যে পরিমাণ মোহরানা নির্ধারিত হবে তার একচ্ছত্র অধিকারী হচ্ছে স্ত্রী নিজে। মোহরানা গ্রহণ ও খরচের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। স্বামী বা অভিভাবকের এতে কোন দখল নেই। স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে তা প্রদান করবে। যদি মোহরানা কনের অভিভাবকের কাছে পরিশোধ করা হয়, তবে অভিভাবকও তা কনেকে দিয়ে দিবে। এতে কোন রকম গড়িমসি করা তো দূরের কথা; বরং এটি ফরয হিসাবে মনের খুশিতে স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে

---

২৩১. সুনান নাসাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮

২৩২. সুনান নাসাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০-৯১, সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৯

২৩৩. আবু সুলাইমান হামাদ ইবন মুহাম্মদ আল খাত্তাবী, মু'আলিমুস সুনান, (বাইরুত : আল মাকতাবা ইলমিয়্যাহ্ , ১৯৮১ খ্রী), খ. ৩, পৃ. ২১৫

www.amarboi.org

ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহরানা মনের খুশিতে দিয়ে দাও।'[২৩৪]

এ আয়াতে বর্ণিত 'নিহলাহ' (মনের খুশিতে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে) শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং স্ত্রীর চাওয়া ব্যতীত বা কোন বাক-বিতণ্ডা, ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য হওয়ার পূর্বেই তাকে মোহরানা দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। কারণ, মামলা-মুকদ্দমা করে যা আদায় করা হয়, তাকে 'নিহলাহ' বা 'স্বতঃস্ফূর্ত দেয়' বলা যায় না। তবে যদি কোন মহিলা মনের তৃপ্তি ও সন্তুষ্টিসহকারে তার মোহরানার কিছু অংশ স্বামী বা অন্য কাউকে দিতে চায়, তবে তা সানন্দে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই। স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ তোমাদের দিয়ে দেয়, তবে তা তোমরা তৃপ্তিসহকারে ভোগ-ব্যবহার করতে পার।'[২৩৫] উল্লেখ্য যে, একবার খুশি মনে মোহরানার কিছু অংশ কাউকে দিয়ে দিলে তা আর ফেরৎ নেয়ার অবকাশ স্ত্রীর থাকে না।

কিন্তু জোরপূর্বক কিংবা ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোন কৌশলে ও অসদোপায়ে স্ত্রীর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে মোহরানার অংশবিশেষ বা পুরো মোহরানা নিয়ে নেয়া বা আত্মসাৎ করা স্বামী বা অভিভাবক কারোর জন্যই বৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এমতাবস্থায় যে, তাদের এক এক জনকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ-সম্পদ প্রদান করেছ, তবে তা থেকে কিছুই ফেরৎ গ্রহণ কর না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে? তোমরা কিভাবে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমরা একজন অন্যজনের সাথে দাম্পত্য মিলনের স্বাদ গ্রহণ করেছ এবং তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গিকার গ্রহণ করেছে।'[২৩৬]

---

২৩৪. বিস্তারিত দ্র. ফখরুদ্দীন আল রাযী, আত-তাফসীর আল-কাবীর, (বাইরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৯৯৫/১৪১৫),খ. ৯, পৃ. ১৮০

২৩৫. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৪

২৩৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২০-২১

www.amarboi.org

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে তাদের কাছ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে শংকিত যে, তারা (দাম্পত্য জীবনে) আল্লাহ্‌র নির্দেশ রক্ষা করে চলতে পারবে না (তবে অন্য কথা)। অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ বা অপরাধ হবে না।'[২৩৭] আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন, আর তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) আটক রেখ না, যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিছু অংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি প্রকাশ্যে কোন অশ্লীলতা করে (সে ক্ষেত্রে অন্য কথা)।'[২৩৮]

উপরিউক্ত তিনটি আয়াতে এটি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীকে মোহরানা বাবদ স্বামী যা কিছু প্রদান করে, তার থেকে কোন কিছুই স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। স্ত্রীকে তার স্বামী যা দিয়েছে স্ত্রীর নিকট থেকে তা ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে (স্ত্রীকে) কষ্ট দেয়া, আটকে রাখা, তার প্রতি যুল্‌ম-অত্যাচার ও নির্যাতন করা, ছলে-বলে কৌশলে তা আদায়ের চেষ্টা করা, শারীরিক আঘাত বা মানসিক চাপ প্রয়োগ করা, মন্দ স্বভাব ও অসদাচরণে অতিষ্ঠ করে তোলা ইসলামী বিধানে সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, মোহরানার মালিকানা স্ত্রীর নিজের; অন্য কারোর তাতে কোন অধিকার নেই। তবে স্ত্রী যদি উশৃঙ্খল হয়, স্বামীকে অপছন্দ করে স্বামীর প্রতি তার বিদ্বেষ প্রকাশ করে, স্বামীর প্রতি অসদাচরণ করে, স্বামীর অধিকার পূরণ বা আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, সর্বোপরি স্বামীকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে না চায়; আর মোহরানা বাবদ যা পেয়েছে তা ফেরত দিয়ে এই স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, কেবলমাত্র তখনই স্বামীর পক্ষে তা গ্রহণ করা বৈধ।

---

২৩৭. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৯

২৩৮. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৯

www.amarboi.org

মোহরানা কখন নির্ধারণ করবে

মোহরানার পরিমাণ বিয়ের সময়ও নির্ধারণ করা যায় এবং বিয়ের পরেও। তবে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে বা পূর্বেই এর পরিমাণ নির্ধারণ করে নেয়া ভাল। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এতে ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা থাকে না এবং কনের জন্যও তা অধিক উপকারী। কারণ, বিয়ের পর মিলনের পূর্বেই যদি কোন কারণে বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে তবে সে স্ত্রী হিসেবে মোহরানার অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী হয়। আর যদি মোহরানা নির্ধারণ না হয়ে থাকে তবে এমতাবস্থায় সে মোহরানার কিছুই পায় না; বরং মুত'আ পেয়ে থাকে।[২৩৯] বিয়ের পর মোহরানা ধার্য করাতেও কোন গুনাহ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং কোন মোহরানা সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাকে কিছু খরচ-মুত'আ দিবে। সামর্থ্যবান ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং বিত্তহীন-স্বল্প আয়ের ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী তা প্রদান করবে।'[২৪০] এতে স্পষ্ট যে, মোহরানা নির্ধারণ ছাড়াও বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। কাজেই কারো মোহরানা পূর্বে নির্ধারিত না হলে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সম্মতিতে একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে নিতে হবে।

এমনিভাবে মোহরানা একবার নির্ধারণের পর স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কম-বেশী করে পুনর্বার মোহরানা নির্ধারণেও কোন ক্ষতি নেই। ইসলামে এরও অনুমোদন আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের কোন গুনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও।[২৪১] অর্থাৎ নির্ধারিত মোহরানার কিছু অংশ পেয়ে বাকী অংশ মাফ করে দেয়া, বা সম্পূর্ণটাই মাফ করে দেয়া অথবা স্বামী নির্ধারিত মোহরানার চেয়ে বেশী পরিমানে মোহরানা পরিশোধ করাতে কোন দোষ বা গুনাহ হবে না। যা-ই করা হোক, তাতে শর্ত হচ্ছে পারস্পরিক সম্মত হয়ে তা করা। মোহরানা

---

২৩৯. আল-কামিল লিন নববী, খ. ১, পৃ. ৪৫৭

২৪০. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩৬

২৪১. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৪

www.amarboi.org

আদায় না করে কোন স্বামী মারা গেলে তার ওয়ারিশদের ওপর তা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়।

মোহরানা ও বর্তমান মুসলিম সমাজ

ইসলামী বিধানে মোহরানার যে গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে বর্তমানে মুসলিম সমাজে সেই গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। এখন এটা কেবল প্রথা বা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। কনে পক্ষ বিরাট অঙ্কের মোহরানা দাবী করে। তারা এটাকে সামাজিক মান-মর্যাদার বাহন বা তালাকের প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। অপরদিকে বরপক্ষ অধিক মোহরানা নির্ধারণকে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে। অথচ মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে কারোরই খবর থাকে না। বস্তুত, মোহরানার সাথে সামাজিক মান-মর্যাদা ও তালাকের কোন সম্পর্ক নেই। মোহরানা স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকার। এটা স্বামীর কাছ থেকে আদায় করা স্ত্রীর কর্তব্য এবং তা প্রদান করা স্বামীর দায়িত্ব। সুতরাং এর পরিমাণ নির্ধারণ হবে বর-কনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী এবং তা সম্পূর্ণরূপে ও যথাসময়ে স্ত্রীর নিকট আদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে।

স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান এর লক্ষ্য। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সামর্থ্যের বাইরে কোন পরিমাণ যদি নির্ধারণ করা হয় আর কার্যত তা আদায় করা না হয়, তাহলে স্ত্রীর এতে কোন উপকারই হয় না; বরং সে তার অধিকার থেকে বঞ্চিতাই রয়ে যায়। উপরন্তু এজন্য পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। বিয়ের সময় মোহরানার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ফরয নয়; বরং স্ত্রীকে তা প্রদান করা ফরয। মোহরানা নির্ধারণ করা ছাড়াও বিয়ে ইজাব-কবুল ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মোহরানা প্রদান না করলে বা প্রদান করার ইচ্ছা না থাকলে সেই স্ত্রী স্বামীর জন্য ভোগ করা হালাল হয় না। কারণ বিয়ের অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ নিজের জন্য হালাল মনে করে নাও।[২৪২]

---

২৪২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৫

www.amarboi.org

হযরত সুহাইব ইবন সানান বর্ণনা করেন, মহানবী (স.) বলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর জন্য মোহরানার একটা পরিমাণ ধার্য করল অথচ তা পরিশোধ করার ইচ্ছেই তার নেই, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে তার স্ত্রীকে প্রতারিত করল এবং অন্যায়ভাবে বাতিল পন্থায় তার গুপ্তাঙ্গ নিজের জন্য হালাল মনে করে তা ভোগ করল। এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যিনাকারী-ব্যভিচারী হিসেবে আল্লাহ্র নিটক উপস্থিত হবে।'[২৪৩]

মোহরানা আদায় না করার এ প্রথাটি বহুলাংশে সামর্থ্যের অধিক মোহরানা ধার্য করার পরিণাম। এর প্রতিকারের সহজতম উপায় হল, আপন সামর্থ্য অনুযায়ী যে পরিমাণ মোহরানা আদায় করা সম্ভব, সে পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা। তাছাড়া তা আদায় করার সৎ নিয়্যাত তো অবশ্যই থাকতে হবে।

যৌতুক সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

পারিবারিক অশান্তির জন্য দায়ী মৌলিক কারণগুলোর একটি হচ্ছে যৌতুক। বর্তমানে এটি একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এর সাথে ইসলামী পারিবারিক বিধানের কোনই সম্পর্ক নেই। যৌতুক লেন-দেন, ব্যক্তি ও পরিবার ও সমাজে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে। ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। যৌতুক বলতে আমাদের সমাজে যা বুঝায় তা হচ্ছে বর পক্ষ কনে পক্ষের নিকট বিয়ের শর্ত হিসেবে দাবী করে যা কিছু আদায় করে, যা না হলে বিয়ে হয় না, যা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা কনে পক্ষের জন্য আবশ্যক, এমন সব বিনিময়কেই যৌতুক বলা হয়। যেমন কনেকে এত ভরি সোনা-গয়না দিতে হবে, যাবতীয় আসবাবপত্র দিতে হবে, বরকে গাড়ি-বাড়ি, নগদ এত হাজার, লক্ষ-কোটি টাকা দিতে হবে ইত্যাদি।

বর্তমান সমাজে বিয়ের উপযোগী যুবকদের বা তাদের অভিভাবকদের মধ্যে যত বেশী সম্ভব যৌতুক আদায়ের একটা ঘৃণ্যপ্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, আশরাফ-আতরাফ সবাই যেন সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে অনেক ঠিক করা বিয়েও শুধু

---

২৪৩. মুসনাদে আহমদ, সূত্র, বুলুগুল আমানী, খ. ১৬, পৃ. ১২৫

www.amarboi.org

যৌতুকের পরিমাণ নিয়ে দরকষাকষি হওয়ার কারণে ভেঙ্গে যেতে দেখা যায়। বহু বিয়ে উপযোগী মেয়ের বিয়ে হতে পারছে না শুধু এ কারণে যে, মেয়ের পিতা ছেলের বা ছেলে পক্ষের দাবী অনুযায়ী যৌতুক দেয়ার সামর্থ্য রাখে না। সবদিক দিয়ে কোন মেয়েকে পছন্দ করার পরও ছেলে বা ছেলের অভিভাবক ঐ মেয়েকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে কেবলমাত্র মেয়ের অভিভাবক যৌতুকের দাবী পূরণ করতে না পারার জন্য।

যৌতুক বিয়ের শর্ত হিসাবে দাবী করার এ অধিকার বর বা বর পক্ষের লোকদের কে দিল? বিয়ের জন্য কোন মুসলিম এমন অন্যায় ও লজ্জাকর শর্তারোপ করতে পারে না। যৌতুক দাবী করার কোন নিয়ম ইসলামে নেই। এটি সরাসরি ইসলাম বিরোধি কাজ। আর যা কিছু ইসলামসম্মত নয় তা পরিত্যাজ্য ও হারাম। মহানবী (স.) বলেন, ইসলাম বহির্ভূত নতুন সংযোজন অবশই ভ্রান্ত।'[২৪৪] দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যৌতুক একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এটি মানবতার মারাত্মক নৈতিক অধঃপতন। যৌতুকের কারণে নারী হচ্ছে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত, এসিডদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ। খুন, আত্মহত্যা ও তালাকের মত জঘন্য অপরাধও এ জন্য ঘটছে।

যৌতুক প্রথা আল্লাহ্র গযব-অভিশাপ, শয়তানের কাজ। এর ভয়ানক পরিণতির শিকার শুধু স্বামী-স্ত্রীই নয়; বরং আপামর জনগণ, গোটা সমাজ এর বিষবাষ্পে দূষিত হচ্ছে। যৌতুক প্রথার কারণে বহু দুগ্ধপোষ্য শিশু ইয়াতিম হচ্ছে, অনেক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী বিপথগামী হয়ে পশুত্বে জীবন যাপন করছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও হয়ে পড়ছে অসহায়-মিসকীন। এ সর্বগ্রাসী কুপ্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে না পারলে নির্বিশেষে সমাজের সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা এমন ফিৎনা থেকে বেঁচে থাক, যা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরকেই স্পর্শ করে না; বরং সবাইকেই এর ভোগান্তি ভোগতে হয়। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।'[২৪৫]

---

২৪৪. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭ ও ৩০

২৪৫. আল-কুর'আন, ৮ ঃ ২৫

www.amarboi.org

দাম্পত্য ও পারিবারিক শান্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন সেগুলো না মানলে বা কিছু মানলে ও কিছু না মানলে সমস্যা দূর হবে না, যৌতুকের অভিশাপ থেকে বাঁচা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'ওহে বিশ্বাসী নারী-পুরুষ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর, (ইসলামের বিধান মেনে চল), আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না।'[২৪৬] অন্য আয়াতে আছে, 'এবং যে ইসলাম ছাড়া অন্য দীন-জীবনব্যবস্থা অন্বেষণ করে (অন্য বিধান ও রীতি-নীতি অনুসরণ করে) তার থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং (তার ইসলাম বিরোধি প্রত্যেকটি কাজের পরিণামে) সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।'[২৪৭] তিনি আরও বলেন, 'তবে কি তোমরা কিতাবের (আল্লাহ্র বিধানের) কতক অংশ বিশ্বাস কর-মেনে চল, আর কতক অংশ অবিশ্বাস ও অমান্য কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ কাজ করে তাদের জন্য দুনিয়ায় দুর্গতি-অপমানই উপযুক্ত শাস্তি এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে।'[২৪৮]

স্ত্রী হালাল হওয়ার উপায় হল দেন-মহর আদায় করা; যৌতুক নেয়া নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আমি আপনার জন্য হালাল করেছি আপনার স্ত্রীদের, যাদের আপনি দেন-মহর আদায় করেছেন।'[২৪৯] অন্যত্র রয়েছে, 'এবং তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা মোহরানা আদায় করে তাদের বিয়ে কর।'[২৫০] 'তোমরা পবিত্র জীবন যাপনের জন্য তাদের মোহরানা আদায় কর; প্রকাশ্য কুকর্ম বা গোপন প্রেমের জন্য অর্থ-সম্পদ দিবে না।'[২৫১] আল্লাহ্র বিধান হল, স্ত্রীকে দেনমহর দিয়ে বিয়ে করার।

---

২৪৬. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২০৮

২৪৭. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ৮৫

২৪৮. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৮৫

২৪৯. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৫০

২৫০. আল-কুর'আন, ৬০ ঃ ১০

২৫১. আল-কুর'আন, ৫ ঃ ৫

www.amarboi.org

এ শর্তটি পালন করতে যারা অক্ষম, তাদেরকে ইসলাম বিয়ে করতে নিষেধ করেছে। কারণ, বিয়ের জন্য এটি পূর্বশর্ত-ফরয, যা অস্বীকার করা কুফরী, পালন না করা কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যারা বিয়ে করতে আর্থিকভাবে সচ্ছল নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করে দেন।'[২৫২] তাছাড়া ইসলাম যেসব কারণে স্বামীকে স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব ও মর্যাদা দিয়েছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, সে তার সম্পদ স্ত্রীর জন্য ব্যয় করবে।[২৫৩] সুতরাং পারিবারিক জীবনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব স্বামীর। যৌতুক স্বামী-স্ত্রীর এই চিরন্তন নিয়মের মূলে কুঠারাঘাত হানে। পুরুষত্বকে নষ্ট করে। পুরুষের বিবেক-বুদ্ধি ও মর্যাদাকে সমূলে ধ্বংস করে।

যারা যৌতুক নেয়, তারা কমপক্ষে পাঁচটি অপরাধ করে। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের বিধান অমান্য করে, স্ত্রীর হক নষ্ট করে, হারাম মাল উপার্জন করে, নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর যুল্‌ম করে এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এ কঠিন পাপাচার থেকে যতদিন পর্যন্ত মানুষ মুখ না ফিরাবে ততদিন পর্যন্ত যৌতুকের অভিশাপ থেকে তার মুক্তি নেই। দাম্পত্য জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ততদিন অশান্তি বাড়তেই থাকবে। তাই পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ও স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন ও ক্রিয়াশীল রাখতে যৌতুক নয়; বরং দেন মহরের বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য।

যৌতুক প্রথা মানবীয় স্বার্থেই পুরুষদের পরিহার করা উচিত। এটি আপাতত লোভনীয় মনে হলেও এর মন্দ পরিণতি সর্বগ্রাসী। এটি কুরআন হাদীসের পরিপন্থী। দুনিয়ার সব অশান্তি ও সমস্যা দূর করে মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে এবং আত্ম উৎকর্ষের পূর্ণতা সাধন করবে, এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং ওহী অবতরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমি আপনার নিকট কুর'আন এজন্য নাযিল

---

২৫২. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩৩

২৫৩. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৪

www.amarboi.org

করিনি যে, আপনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবেন;[২৫৪] বরং আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষকে (কুফর, শিরক, ও যাবতীয় মন্দকর্মের) অন্ধকার থেকে (ঈমান, সত্য-সঠিক ও শান্তির) আলোর দিকে মানুষকে নিয়ে আসেন।[২৫৫] যৌতুকে কোন কল্যাণ থাকলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এর কোন সমর্থন থাকত। তাতো নেই-ই; বরং তা বর্জনের জন্য তাকীদ রয়েছে; হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য সব মুমিন-মুসলিম তথা সব মানুষকেই তা বর্জন করা কর্তব্য।

(খ) সাক্ষীদের উপস্থিতি

বিয়েতে সাক্ষীদের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। সাক্ষী ছাড়া কোন বিয়েই শুদ্ধ হয় না। দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীন মুসলিম সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতি ছাড়া মুসলমানদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় না। সাক্ষীদ্বয়ের দু'জনই পুরুষ হবে অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হবে। তারা ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক অথবা কোন মিথ্যা অপবাদের দায়ে দণ্ডিত হোক তাতে কিছু যায় আসে না।[২৫৬] কারণ, বিয়ে অন্যান্য চুক্তির মত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি; বরং সবচেয়ে কঠিন ও সুদৃঢ় চুক্তি বা অঙ্গিকার। এ চুক্তির সাথে একজন নারী ও একজন পুরুষের অগণিত লেন-দেন ও দায়িত্ব-কর্তব্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আর তোমরা দু'জন সাক্ষী নির্ধারণ করবে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী সাক্ষী নির্ধারণ করবে; যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।'[২৫৭]

উল্লেখ্য যে, সাক্ষীগণ মুসলিম হতে হবে। কুরআনের বাণী, 'তোমাদের

---

২৫৪. আল-কুর'আন, ২০ ঃ ২

২৫৫. আল-কুর'আন, ১৪ ঃ ১

২৫৬. হেদায়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৬

২৫৭. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৮২

www.amarboi.org

পুরুষদের মধ্য থেকে' অংশে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা কিছুতেই মুসলমানদের ওপর কোন (ধর্মীয়) বিষয়ে কাফিরদের জন্য কোন সুযোগ দেন না।[২৫৮] বস্তুত, স্বামী-স্ত্রীর কেউ যেন বিয়েকে অস্বীকার করতে না পারে, পারস্পরিক দায়িত্ব পালনে যেন পিছু হটতে না পারে, বিয়ের বৈধতা নিয়ে পরিবারে ও সমাজে যেন কোনরূপ সংশয় না থাকে, সর্বোপরি স্বামী-স্ত্রীর কেউই যেন কোন ধরনের প্রতারণা ও অশান্তির শিকার না হয়, সে জন্য বিয়েতে সাক্ষীদের উপস্থিতি ইসলামী বিধানে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(গ) আক্দ বা বিয়ের বন্ধন স্থাপন

ইসলামে বিয়ের বন্ধন পদ্ধতি অন্য যে কোন ধর্ম বা জাতির বিয়ের বন্ধন পদ্ধতির চেয়ে সহজ ও আইনসম্মত। বর-কনের দু'টি শব্দের উচ্চারণেই বিয়ের বন্ধন স্থাপিত হয়ে যায়। হেদায়া গ্রন্থাকার বলেন, 'বিয়ে ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।'[২৫৯] এই ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হয়ে গেলেই বিয়ের বন্ধন হয়ে যায়। ইজাব-কবুলের সময় সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা এবং ইজাব-কবূলের শব্দাবলী তাদের নিজ কানে শুনা ওয়াজিব। আক্দ বা বিয়ের বন্ধনের পর খুৎবা পড়ে বর-কনের জন্য দু'আ করা সুন্নাত।

অনুষ্ঠান করে বিয়ে করা

একটি ছেলে ও একটি মেয়ের বিবাহিত জীবন সংশয়মুক্ত, নির্ভেজাল, শান্তি পূর্ণ হওয়ার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী তথা সমাজের আনুকূল্য, সমর্থন ও অনুমোদন একান্ত প্রয়োজন। কারণ, বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণ নয়; বরং আজীবন একে অপরের পরিপূরক ও বন্ধু হয়ে একটি পরিবার গঠন করে বৈধভাবে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটানো এবং স্বাচ্ছন্দ্য জীবন লাভ করা। পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষকে বলা হয়েছে, বিয়ে করবে পূত-পবিত্র জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে; কাম-বাসনা

---

২৫৮. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৪১

২৫৯. হেদায়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৫

www.amarboi.org

চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়।[২৬০] এজন্য ইসলাম গোপন ও লুকোচুরি বিয়ে পছন্দ করে না। বিয়ে অনুষ্ঠান হবে প্রকাশ্যে, সকলকে জানিয়ে, সমাজের সমর্থন নিয়ে। বিয়ের কাবিননামা রেজিস্ট্রেরী করার সময় মূল সাক্ষীদের অতিরিক্ত দু'জন সাক্ষী মজলিস বা অনুষ্ঠান থেকে নেয়ারও বিধান রয়েছে।

ইসলাম বিয়ে সম্পাদনের কাজে সমাজকে সাক্ষী রাখতে চায়। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার কর এবং এ অনুষ্ঠান মসজিদে সম্পন্ন কর আর এ সময় এক তারা বাদ্য বাজাও।[২৬১] বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রচার সম্পর্কিত আদেশ স্পষ্ট ও অকাট্য। এর ব্যতিক্রম হলে সে বিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। তবে আনুষ্ঠানিকতার নামে অশ্লীল নাচ, গান ও আসর সাজানো, সবাই মিলে বৈধ সীমালঙ্ঘন করে আনন্দ-উল্লাস, বেহায়াপনা ও অসামাজিক আচার-অনুষ্ঠান কিছুতেই জায়েয নয়। কারণ, এতে বিয়ের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

বিয়ের সময় বর-কনের গায়ে হলুদ

বিয়ের সময় বর-কনের গায়ে হলুদ মাখা এবং চাকচিক্যময় পোশাক পরিয়ে সুসজ্জিত করা ইসলামী বিধানে অনুমোদিত। মুসলিম মনীষীদের অভিমত হচ্ছে, যে লোক বিয়ে করবে সে যেন বিয়ে ও আনন্দ উৎসবের নিদর্শনস্বরূপ গায়ে হলুদ মাখে এবং রঙিন কাপড় পরিধান করে। ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, সব রং ও বর্ণের মধ্যে হলুদ বর্ণই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি পবিত্র কুরআনের এই বাণী পাঠ করেছিলেন, 'উজ্জ্বল হলুদ বর্ণসম্পন্ন, যার রং চকচকে, দর্শকদের মনকে আনন্দে ভরে দেয়।[২৬২]' বস্তুত বর ও কনেকে সাজানো, গায়ে হলুদ দেয়া এবং আনন্দ-উল্লাস করা জায়েয। তবে বরকে পুরুষরা এবং কনেকে

---

২৬০. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৪-২৫

২৬১. জামে' তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৯

২৬২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৬৯

www.amarboi.org

মেয়েরা সাজাবে। হলুদ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষের অবাধ মিলন, শরী'আতের সীমালঙ্ঘন কোন মুসলিমের জন্যই সমর্থনযোগ্য ও শোভন নয়।

ইসলামী বিধানে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন

জায়া ও পতি (স্ত্রী ও স্বামী) শব্দদ্বয় মিলে দম্পতি শব্দের উৎপত্তি। ইসলামের পরিভাষায় বিধিসম্মত উপায়ে একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে যে জীবন যাপন করে তাকে দাম্পত্য জীবন বলা হয়। দাম্পত্য জীবন পারিবারিক জীবনের মূল শক্তি। পরিবারের সুখ-শান্তি, শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে দাম্পত্য জীবনের সফলতার ওপর নির্ভরশীল। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক অতি প্রাকৃত, ঘনিষ্ঠ, অবিচ্ছেদ্য, গভীর ও নিবিড়। আর এ জন্যই কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বাণীতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতিশব্দ হিসেবে 'যাওজ' এবং ইংরেজী অনুবাদে Spouse (স্বামী বা স্ত্রী) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[২৬৩] বস্তুত স্বামী-স্ত্রী দু'জন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা যেন একটি মাত্র অস্তি ত্ব সর্বক্ষেত্রে, আবেগে অনুভূতিতে, চিন্তা-চেতনায় ও সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতায়।

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মনে এটা বদ্ধমূল করে দেয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী তার স্বামীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখা এবং গতিশীল রাখার জন্য তারা একে অপরের সহযোগী, প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। অতএব স্বামীকে বলা হল, স্ত্রী তোমার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[২৬৪] কেউ তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর স্ত্রীকে

---

২৬৩. আল-কুর'আন, ৭৬ ঃ ৩৯, ২ ঃ ৩৫, ২১ ঃ ৯০ বিস্তারিত দ্র. আল্লামা আহমাদ মুস্ত ফা আল মারাগী, তাফসীর আল মারাগী, (বাইরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাস আল আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৯০

২৬৪. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৫

www.amarboi.org

বলা হল, পুরুষ ও তোমার সৃষ্টির উপাদান এক। সে-ই তোমার মূল-আসল। তুমি তোমার মূল ছাড়া চলতে পার না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, هو الذى خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها - 'তিনিই তো আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে এবং সেই সত্তা থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন।[২৬৫] অর্থাৎ একই উৎস ও উপাদান থেকে নারী ও পুরুষের সৃষ্টি। কেউ কেউ বলেন, বিবি হাওয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.) এর বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেছেন।[২৬৬]

একজন পুরুষ ও একজন নারী বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে মিলন হওয়ার পূর্বেই একে অপরের কাছে এমন আপন ব্যক্তিতে পরিণত হয় যে, মিলনের পূর্বে কোন কারণে কেউ মারা গেলে অপরজন তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, তার জন্য শোক পালন করতে হয়।[২৬৭] স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের নিরন্তর সাক্ষ্য বহন করছে পবিত্র কুরআনের একটি বাণী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, هن لباس لكم وانتم لباس لهن - 'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা (স্বামীরা) তাদের ভূষণ।[২৬৮] আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভূষণ-লেবাস অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে তুলনা করে মূলতঃ তাদের সম্পর্কের গভীরতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ তাদের দু'জনের সম্পর্ক এত গভীর যে, পৃথিবীতে এর চেয়ে গভীর ও সুদৃঢ় কোন সম্পর্ক হতে পারে না। এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে একই মর্যাদা ও একই পর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়েছে এবং উভয়েই উভয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত 'লেবাস' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের লেবাস বলার অনেক কারণ হতে পারে। পোশাক পরিধান করা ব্যতীত যেমন কোন মানুষ থাকতে পারে না, শান্তি ও স্বস্তি পায় না, তেমনি

---

২৬৫. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ১৭৯

২৬৬. ইসমাঈল ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, (করাচী : মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৪৮৭

২৬৭. জামে' তিরমিযি, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬

২৬৮. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৮৭

www.amarboi.org

বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত কোন নারী-পুরুষ (ব্যতিক্রম ছাড়া) কখনও শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। মানব জীবনে পোশাক যেমন গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য অপরিহার্য,[২৬৯] তেমনি পুরুষের জৈব-মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নারী এবং নারীর জৈব-মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য পুরুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী। একজনকে ছাড়া অন্যজনের জীবন অসম্পূর্ণ। জীবন পরিপূর্ণ হয় পুরুষ তার স্ত্রীকে পেয়ে এবং নারী তার স্বামীকে নিয়ে।

লেবাস বা পোশাকের আর এক নাম 'যীনাত-সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সৌন্দর্য তথা উত্তম পোশাক গ্রহণ কর-পরিধান কর।[২৭০] এই অর্থে স্বামী তার স্ত্রীর শোভা এবং স্ত্রী তার স্বামীর সৌন্দর্য। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জীবনকে শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক তথা সামগ্রিকভাবে সুন্দর, সুশোভিত ও বিকশিত করবে-এটাই ইসলামের দাবী, আর তখনই তারা একে অপরের সত্যিকারের লেবাস-পোশাক হিসেবে পরিগণিত হবে।

পোশাক যেমন রোদ, বৃষ্টি, শীত ও গরম থেকে রক্ষা করে তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের আত্মসম্ভ্রম ও সতীত্বের রক্ষাকারী। বিবাহিত জীবনে একজন পুরুষ ও একজন নারীর অবাধ মেলা-মেশার আইনসম্মত ও সমাজ স্বীকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে অন্যায়ভাবে কাম-বাসনা চরিতার্থ করা, ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী হওয়া কিংবা উপ-পত্নি গ্রহণ করা বা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার মত কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া থেকে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। আত্মসম্মান, সতীত্ব ও ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত রেখে পূত-পবিত্র জীবন-যাপনে তারা যেন একে অপরের জন্য পোশাকতুল্য।

---

২৬৯. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ২৬

২৭০. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ৩১

www.amarboi.org

স্বামী-স্ত্রী একজন অন্যজনের জন্য পোশাকের সাথে তুলনা করার আরেকটি কারণ হল, পোশাক যেমন পরিধানকারীর অনুগামী তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের অনুগামী। তবে অনুগামী হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী অগ্রগামী হবে। কারণ, উক্ত আয়াতে প্রথমে স্ত্রীকেই স্বামীর পোশাক বলা হয়েছে। এর সমর্থন রয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের যেরূপ অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর তাদের ওপর পুরুষদের এক স্তর রয়েছে।[২৭১] এখানে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্ত্রীর সাথে চলনে-বলনে, মিলনে ও দায়-দায়িত্ব পালনে স্বামীর অগ্রগামী হওয়া ও আধিক্য বিস্তার করা জরুরী ।

পোশাক যেমন শরীরের আরাম আয়েশ বৃদ্ধি করে তেমনি দাম্পত্য জীবন স্বামী-স্ত্রীর মনকে সদা আনন্দ উৎফুল্ল রাখে, মনের গভীরে অনাবিল শান্তি ও তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দেয়, শ্রান্ত মনে সান্ত্বনা আনে ও ক্লান্তি দূর করে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, 'যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর'- বাণীতে এটাকেই দাম্পত্য জীবনের আসল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'و جعل منها زوجها ليسكن اليها - এবং তিনি (আল্লাহ্) তার থেকেই তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যেন তার কাছ থেকে সে শান্তি লাভ করতে পারে।'[২৭২]

স্বামী-স্ত্রী মিলন শয্যায় যে অবস্থায় মিলিত হয়, এতে একজন অন্যজনের পোশাকস্বরূপ হয়ে যায়। 'فلما تغشها حملت حملا خفيفا - অতঃপর সে (স্বামী) যখন তাকে (স্ত্রীকে) আবৃত করল, তখন সে গর্ভবতী হল'[২৭৩]- বাণীটিও তাই প্রমাণ করছে। প্রখ্যাত মনীষী রবী ইব্ন আনাস (র.) বলেছেন, স্ত্রী তার স্বামীর জন্য শয্যাবিশেষ আর স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর জন্য লেপ বিশেষ।'[২৭৪]

---

২৭১. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৮

২৭২. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ১৮৯

২৭৩. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ১৮৯

২৭৪. আত-তাফসীর আল-কবীর, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৬

www.amarboi.org

তাছাড়া যে জিনিস মানুষের দোষ ঢেকে দেয়, ত্রুটি গোপন করে, তাই হচ্ছে পোশাক। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দোষ লুকিয়ে রাখে, কেউ কারো কোন প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে বা জানতে পারলে তার প্রচার বা প্রকাশ করে না, প্রকাশ হতে দেয় না। এ জন্য একজনকে অন্যজনের পোশাক বলা হয়েছে।[২৭৫]

কুরআন মাজীদে অন্য এক প্রকার পোশাকেরও উল্লেখ রয়েছে, যা দিয়ে সাধারণ পোশাকের মত গা ঢাকা যায় না, শীত-গ্রীষ্মে যা কোন উপকারে আসে না, যা তৈরি করার জন্য কোন কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না। অথচ এটিই হচ্ছে সর্বোত্তম, অধিক কল্যাণকর ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পোশাক। কুরআনে এমন পোশাকের নাম দেয়া হয়েছে 'লেবাসুত তাকওয়া' আল্লাহ্ ভীতির পোশাক, সর্বোচ্চ সতর্কতার পোশাক, অন্যায়-অপকর্ম থেকে আত্মরক্ষার ও যাবতীয় সত্য-ন্যায়ের অনুসরণে মানবিকতার বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের পোশাক। মন থেকে সব রকম সংকীর্ণতা, কুটিলতা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কাম-ক্রোধ, কপটতা-ভণ্ডামী, মিথ্যা, অহংকার, বিশ্বাসঘাতকতা, দায়িত্বহীনতা, কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা, পরের ক্ষতি সাধন, ভেজাল, ওজনে ও মাপে কম দেয়ার মানসিকতা ইত্যাদি নিন্দনীয় স্বভাবগুলোকে ঢেকে ফেলার-দমন করার হাতিয়ার হচ্ছে 'লেবাসুত তাকওয়া'। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত নিন্দনীয় স্বভাবের কোন একটিও অবশিষ্ট থাকে না, এর সবই দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্যই স্বামী-স্ত্রীর উভয়কে উভয়ের লেবাস-পোশাক বলা হয়েছে।

তাছাড়া কঠিন বিপদে, সম্মুখ যুদ্ধে আত্মরক্ষার যে হাতিয়ার তাকেও কুরআন মাজীদে লেবাস বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর আমি তাকে দাঊদ (আ.)কে তোমাদের জন্য লেবাস-বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছিলাম। যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে।'[২৭৬] স্বামী-স্ত্রীর

---

২৭৫. মাহাসিনুত তাবীল, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬

২৭৬. আল-কুর'আন, ২১ ঃ ৮০

www.amarboi.org

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভাব-অনটন ইত্যাদির মত বিপদ যত কঠিন হোক না কেন সর্বাবস্থায় তারা একে অপরের অবলম্বন, একে অপরের ভরসা ও বিপদ মোকাবিলার হাতিয়ার। তাই তাদেরকেও পরস্পরের লেবাস বলা হয়েছে।

বস্তুত, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলে মিশে হৃদ্যতার সাথে জীবন যাপন করবে, একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করবে, একজন অন্যজনের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে কলংকের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারসমূহ যথাযথভাবে পালন করবে -এটা এ আয়াতের দাবী, ইসলামের বিধান। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককেই একে অপরের পোশাক বলা হয়েছে; একজনকে পোশাক আর অন্যজনকে পোশাকের বাহন-শরীর বলা হয়নি। এতে স্বামী-স্ত্রীর একতা, অভিন্নতা ও সমতার কথা আইনগত সমতার চেয়েও বেশি বলা হয়েছে। দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের এই গভীরতাই তাদেরকে একে অপরের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে আজীবন প্রতিষ্ঠিত রাখে।

পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

একের ওপর অপরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় যেসব কারণে তার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অন্যতম। ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্ককে রক্ত সম্পর্কের অনুরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ক রচিত হয় যে দু'টি মূল স্তম্ভকে ঘিরে এর একটি হচ্ছে রক্তের বন্ধন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্কের বন্ধন। ইসলামে বিয়ের বন্ধনকে 'দৃঢ় বন্ধন' (মীছাক গালীজ)[২৭৭] বলা হয়েছে। এই বন্ধনের ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরের প্রতি কর্তব্য পালন অবধারিত হয়ে যায়। এটি এমন এক বন্ধন, যা সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ও সুদূর প্রসারী কল্যাণের ধারক ও বাহক। হাম্মাদান আব্দুলাতি বলেছেন, The role of husband evolves around the

---

২৭৭. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২১

www.amarboi.org

moral principle that it is his solemn duty to God to treat his wife with kindness, honour and patience, to keep her honourably or free her from marital bond honourably and to cause her no harm or grief [278] অর্থাৎ সংসারে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে মর্যাদা দেয়া, সম্মান করা, ধৈর্যের সাথে ব্যবহার করা এবং প্রয়োজন হলে সম্মানজনকভাবে বন্ধন থেকে মুক্তিদান করা; যাতে তার ক্ষতি না হয়, দুঃখ না পায়।

স্ত্রীর কর্তব্য, সংসারে অংশীদার হিসেবে সুখ-শান্তি বজায় রাখা, বিবাহিত জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে তোলা, স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাগিদার হওয়া এবং এমন ব্যবহার না করা যাতে স্বামী অপমান বোধ না করে, অন্তরে আহত হয়। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, 'সাবধান! নিশ্চয় তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদেরও তাদের ওপর অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে তারা তোমাদের বিছানায়-শয্যায় এমন কাউকে গ্রহণ করবে না, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর এবং তোমাদের গৃহে তোমাদের অপছন্দের কোন ব্যক্তিকে ঢুকার অনুমতি দিবে না। আর তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হচ্ছে তোমরা তাদের প্রতি তাদের খাওয়া-পরায় উত্তম পন্থা অবলম্বন করবে।'[২৭৯] অর্থাৎ ইসলামে যেভাবে স্বামীর অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তেমনি স্ত্রীর অধিকারও সুরক্ষিত করা হয়েছে। উভয়ের অধিকারসমূহ কুরআন ও হাদীসে সমান গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করা হয়েছে।

স্ত্রীর অধিকার ঃ স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য

স্ত্রীর অধিকার প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার

---

278. Islam in Focus, (Syria : Holy Quran Publishing house, 1977), P. 117-118

২৭৯. জামে' তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯

www.amarboi.org

ওপর অধিকার রয়েছে।[২৮০] এমনিভাবে স্বামীরও অধিকার রয়েছে স্ত্রীর ওপর। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেছেন, 'স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের ওপর।'[২৮১] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনি স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর'[২৮২] তাদের অধিকারের গুরুত্ব বর্ণনা করে আরও বলা হয়েছে, 'আর তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের কাছ থেকে (যাবতীয় অধিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে) অত্যন্ত শক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।[২৮৩] মহানবী (স.) ইন্তিকালের পূর্বে যে কয়টি বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন, এর একটি হল স্ত্রীদের অধিকার প্রদান সম্পর্কিত। তিনি বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা, স্ত্রীরা তোমাদের হাতে ন্যস্ত। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানতে গ্রহণ করেছ এবং তাদের গুপ্তাঙ্গ আল্লাহ্র কালিমায়-বিধানে হালাল করে নিয়েছ।[২৮৪] স্ত্রীর অধিকার বা স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল ঃ

মোহরানা প্রদান

স্বামী তার স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করবে। কেননা স্বামী হিসেবে স্ত্রীর ওপর তার যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তা মোহরানার বিনিময়েই হয়। ইসলাম মোহরানা পরিশোধ করাকে স্বামীর জন্য ফরয করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'এবং স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষসহকারে আদায় কর।'[২৮৫] মোহরানা ছাড়া বিয়ে হয় না। স্ত্রী হালাল বা বৈধ হওয়ার জন্য মোহরানা প্রদানকে শর্ত হিসেবে আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা

---

২৮০. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৩ ও ৯০৬

২৮১. 'উমদাতুল ক্বারী, প্রাগুক্ত, খ. ২০. পৃ. ১৮৮

২৮২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৮

২৮৩. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২১

২৮৪. ইহইয়াউ 'উলুম আল দীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪

২৮৫. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৪

www.amarboi.org

বলেন, 'এবং মুহাররাম নারী ছাড়া তোমাদের জন্য অন্যসব নারী হালাল করা হয়েছে এ শর্তে যে, তোমরা নিজেদের অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে গ্রহণ কর।... অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক পরিশোধ কর।[২৮৬]

সুতরাং বিয়ের সময় নারী ও পুরুষের মধ্যে মোহরানার যে চুক্তি হয়ে থাকে তা পূর্ণ করা পুরুষের জন্য অপরিহার্য। সে যদি চুক্তি মুতাবিক মোহরানা আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী তার থেকে নিজেকে আলাদা রাখার অধিকার রাখে। কোন স্বামী মোহরানা আদায় না করলে বা মোহরানা আদায় করার দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে তার জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল না হয়ে ব্যভিচারে পরিণত হয়; যা ইসলামী শরীআতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। বস্তুত পুরুষের ওপর এটা এমন এক দায়িত্ব যা থেকে রেহায়-নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনই পথ নেই। তবে স্ত্রী যদি তাকে সময় দেয়, অথবা তার দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে সন্তুষ্ট মনে মাফ করে দেয় অথবা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে খুশির সাথে নিজের দাবী প্রত্যাহার করে নেয় তবে ভিন্ন কথা। 'যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের মোহরানার অংশবিশেষ মাফ করে দেয় তাহলে তোমরা তা তৃপ্তির সাথে ভক্ষণ কর।'[২৮৭] মোহরানার চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণে কমবেশি করে নাও, এতে কোন দোষ নেই।'[২৮৮]

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদান

ইসলামী আইন বিধান স্বামী স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রের সীমা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে ঘরে অবস্থান করা ও পারিবারিক জীবনের দায়িত্বসমূহ পালন করা।[২৮৯] আর পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে আয়-উপার্জন করা

---

২৮৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৪

২৮৭. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৪

২৮৮. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৪

২৮৯. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৩৩

www.amarboi.org

এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অর্জিত পবিত্র সম্পদ (নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে) ব্যয় কর'[২৯০] তাছাড়া যেসব কারণে স্বামীকে পরিবারের কর্তা (ক্বাওয়াম) বলা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রী-পরিজনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'পুরুষ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ্ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।'[২৯১]

তাছাড়া ইসলামী শরী'আতের বিধান মতে যদি কেউ কারো উপকার বা কল্যাণের জন্য আবদ্ধ হয়ে যায় এবং এজন্য তার জীবিকা উপার্জনের কোন সুযোগ না থাকে তাহলে তার ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ সেই ব্যক্তির ওপর বর্তায় যার স্বার্থে সে আবদ্ধ হয়েছে। যেমন সাক্ষ্যদাতাদের যাবতীয় ব্যয়ভার তাদেরকেই বহন করতে হয় যাদের অনুকূলে তারা সাক্ষ্য দেয়। মহিলা হাজীর সফর সঙ্গী কোন মুহাররাম পুরুষের ব্যয়ভার সেই মহিলা হাজীকেই বহন করতে হয়। অনুরূপভাবে স্বামী কর্তৃক আবদ্ধ হওয়ার কারণে স্ত্রীর জীবিকা উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর ওপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর সন্তানদের অধিকারী (পিতার) ওপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের (স্ত্রীদের) ভরণ-পোষণ অবশ্য কর্তব্য।'[২৯২] মহানবী (স.) বলেন, তাকে (স্ত্রীকে) খাওয়াবে যখন তুমি খাবে, তাকে পোশাক-পরিচ্ছদ দেবে যখন তুমি যে মানের পোশাক গ্রহণ করবে।[২৯৩]

---

২৯০. আল-কুর'আন, ২ : ২৬৭

২৯১. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

২৯২. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৩

২৯৩. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

www.amarboi.org

ভরণ-পোষণের পরিমাণ বা মান নির্ধারণ স্ত্রীর পারিবারিক অবস্থা বা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা স্বামীর সামর্থ্যের ওপরেই নির্ভরশীল। স্বামী বিত্তবান হলে বিত্তবানসুলভ ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালী না হয়, দরিদ্র ও ফকীর হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দারিদ্র্যসুলভ ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিত্তশালী ও ধনী হয়। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতও তাই। কুরআন মাজীদ এ বিষয়ে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, على الموسع قدره و على المقتر قدره– 'ধনী ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।'[২৯৪] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, যে ব্যক্তিকে অর্থ-সম্পদে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে তার কর্তব্য হচ্ছে সেই হিসেবেই তার স্ত্রী-পরিজনের জন্য ব্যয় করা। আর যার আয়-উপার্জন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সেভাবেই আল্লাহ্র দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ দরিদ্রের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।'[২৯৫] এই বাণীতে সেসব স্বামী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সচ্ছলতা লাভ করবে বলে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা যথাসাধ্য সর্বোচ্চ মানে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ করে না।

স্ত্রীর যদি চাকর-চাকরানীর প্রয়োজন হয়, তাহলে স্বামীর সামর্থ্য থাকলে চাকর-চাকরানী রেখে দেয়াও স্বামীর কর্তব্য। এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণ সম্পূর্ণ একমত। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেছেন, 'চাকর-চাকরানীর ব্যয়ভার বহন করাও সামর্থ্যবান স্বামীর ওপর ওয়াজিব। এমনকি একাধিক কাজের লোকের প্রয়োজন হলে তারও ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, দুই বা তিন জন কাজের লোকের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। আর ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, স্বামীর

---

২৯৪. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩৬

২৯৫. আল-কুর'আন, ৬৫ ঃ ৭

www.amarboi.org

কর্তব্য হচ্ছে, শুধু দু'জন খাদেমের-কাজের লোকের ব্যবস্থা করা ও খরচ বহন করা। তাদের একজন হবে ঘরোয়া কাজ করার জন্য এবং অন্যজন হবে বাইরের কাজ-কর্ম সম্পন্ন করার জন্য।[২৯৬]

দৈহিক মিলনের সুখ ও মাধুর্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমভাবে ভোগ করে। অথচ এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী কেবল স্ত্রীকেই ভোগ করতে হয়। পুরুষকে তার কোন ঝুঁকিই বহন করতে হয় না। এ হচ্ছে এক স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। স্ত্রীকে প্রকৃতির এই দাবী পূরণে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই স্বামীকে স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে সর্বদা সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে এটিও মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীর দায়ভার বহনের অর্থ কেবল এই নয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর প্রয়োজনীয় সবকিছু যোগাড় করে দিবে বা কিনে দেবে; আর এতে স্ত্রীর পছন্দ-অপছন্দ বা খুশি-অখুশির কোন বিষয় থাকবে না; বরং স্ত্রীর খাওয়া-পরা, সাজ-গোজসহ সবকিছু তার পছন্দমত দেয়াই হচ্ছে স্বামীর কর্তব্য।

উপরন্তু স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে অতিরিক্ত হাত খরচের টাকাও প্রদান করতে হবে। যেন স্ত্রী নিজ ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী সময়ে-অসময়ে খরচ করতে পারে। মহানবী (স.) বলেন, স্ত্রীদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে তোমরা তাদের সাথে সৌজন্যতা-উদারতা দেখাবে, প্রয়োজন পূরণ করেও অতিরিক্ত কিছু দিবে।[২৯৭] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা ও সৌজন্যতার নির্দেশ দিয়েছেন।'[২৯৮] স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আস্থা ও নির্ভরশীলতা বাড়াতে ইসলামের এই সৌজন্যতার নিয়মটি খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

সদ্ব্যবহার পাওয়া

স্বামীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার

---

২৯৬. কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপতী, *তাফসীর মাযহারী*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭). খ. ৯, পৃ. ৩৩২

২৯৭. জামে' তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ১৩৯

২৯৮. আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ৯০

www.amarboi.org

করা। সদ্ব্যবহার পাওয়া স্বামীর ওপর স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকারও বটে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[২৯৯] কুরআন মাজীদের আয়াতাংশ 'و الصاحب بالجنب- -সাহিবি বিলজানবি'[৩০০]এর অর্থে কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, সে হচ্ছে স্ত্রী। অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ ও দায়িত্বশীল হও। হাদীসে স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করাকে পূর্ণ ইসলাম ও উত্তম চরিত্রের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মুমিন তারা, যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর-উত্তম-নিষ্কলুষ এবং তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভাল।'[৩০১] তিনি আরও বলেন, স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ কর। কেননা তারা তোমাদের নিকট কয়েদি বা বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির মত।[৩০২] সুতরাং স্ত্রীদের প্রতি সাধ্যাতিত বা অন্যায় কাজের বোঝা চাপানো বা অশালীন-কর্কশ, কঠোর কথা-বার্তা পরিহার করে যৌক্তিক ও সদাচরণ করা স্বামীর কর্তব্য।

যুল্ম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকা

স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীর ওপর তাকে যে অগ্রাধিকার ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে সে তার অপব্যবহার করতে পারবে না। সর্বপ্রকার যুল্ম-অত্যাচার ও দমন-পীড়ন-নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকা স্ত্রীর মৌলিক অধিকার। পারিবারিক পরিমণ্ডলে, গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে স্বামী বা স্বামীর নিকটজনের হাতে নির্যাতিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হয়ে সারা জীবন মৃত প্রায় হয়ে টু শব্দটি না করে সংসারে টিকে থাকার জন্য অথবা আত্মহননের পথ বেছে নেয়ার জন্য স্ত্রীদের তৈরি করা হয়নি। স্বামীর

---

২৯৯. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৯

৩০০. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৬

৩০১. জামে' তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ১৩৮

৩০২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯

www.amarboi.org

অত্যাচারের স্ট্রিম রোলার চালানোর ক্ষেত্রও সে নয়। কাজেই দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে যে কোন রকম নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার মানবিক ও আইনগত অধিকার তার রয়েছে। স্বামীর যুল্ম অত্যাচার ও অন্যায় আচরণের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন,

ক. ঈলা

কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে শুধু শাস্তি ও যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করা থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে ঈলা। এর জন্য ইসলামী বিধান সর্বোচ্চ চার মাসের সময়সীমা বেধে দিয়েছে। স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে এ সময়ের মধ্যে সে তার স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে নিবে। অন্যথায় এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার শপথ করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। যদি তারা এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। আর যদি তারা তালাক দেয়ারই সংকল্প করে, তাহলে আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন ও জানেন।'[৩০৩] ইচ্ছাকৃতভাবে যে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকে, তার ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, 'তাকে মিলনে বাধ্য করা হবে অথবা এমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে।'[৩০৪]

খ. ক্ষতি সাধন ও সীমালঙ্ঘন

স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ না থাকলে বা বনিবনা না হলে তাকে ন্যায়ানুগ পন্থায় বিদায় করে দেয়ার বিধান ইসলামে রয়েছে। কিন্তু শুধু নির্যাতন করার জন্য তাকে আটকে রাখা, বার বার ছেড়ে দেয়ার হুমকি দেয়া, এক বা দুই তালাক দিয়ে তৃতীয় তালাকের পূর্বে পুণগ্রহণ করার মত জঘন্য আচরণ করতে কুরআন মাজীদে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه- و لا

---

৩০৩. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৬

৩০৪. সহীহ আল-বুখারীর হাশিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৩

www.amarboi.org

–هذوا ولا تتخذوا ايت الله 'এবং তোমরা তাদেরকে নির্যাতন ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটকে রেখ না। যে ব্যক্তি এমন করবে সে নিজের ওপরই অত্যাচার করবে। আর তোমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে-বিধানসমূহকে তামাশার বস্তু বানিয়ো না।'[৩০৫] আয়াতে 'দিরার'-ক্ষতি সাধন ও 'ই'তিদা'-সীমালঙ্ঘন শব্দদ্বয় ব্যাপক অর্থবোধক। সব রকম নির্যাতনই এর অন্তর্ভুক্ত। আর এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে কোন স্ত্রীকে আটকে রাখবে, সে তাকে সব রকম পন্থায়ই নির্যাতন করবে। তাকে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেবে। নিম্ন শ্রেণীর লোক হলে মার-ধর ও গালিগালাজ করবে। উচ্চ শ্রেণীর লোক হলে নির্যাতন ও অপমান করার ভিন্ন পথ অবলম্বন করবে। যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এ ধরনের আচরণ করে তবে সে বৈধ সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর অধিকার রয়েছে যে, সে আইনের সাহায্য নিয়ে এই ব্যক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার।[৩০৬]

স্ত্রীর জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করা

স্ত্রীদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তাদের খামখিয়ালীসুলভ সব জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করা স্বামীর উচিত। মহানবী (স.) বলেন, 'স্ত্রীদের মন্দ আচরণে যে স্বামী ধৈর্য ধরে, সে হযরত আয়ূব (আ.)কে তার কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্যধারণের কারণে যে পরিমাণ পুণ্য আল্লাহ্ দান করেছিলেন, তাকেও সেই পরিমাণ পুণ্য দান করবেন এবং কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর মন্দ আচরণে ধৈর্য ধরে তবে ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়াকে যে সাওয়াব দিয়েছিলেন, সেই স্ত্রীকেও অনুরূপ সাওয়াব আল্লাহ্ দান করবেন।[৩০৭]

পারিবারিক জীবনের নানা খুঁটি-নাটি বিষয়াদি বা চাওয়া-পাওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটি, ঝগাড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য বা মান-অভিমান হওয়া

---

৩০৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩১

৩০৬. সাইয়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, অনু, মুহাম্মদ মূসা, *স্বামী-স্ত্রীর অধিকার*, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ, ৩৩-৩৫

৩০৭. ইহইয়াউ উলূম আল দীন, খ. ২, পৃ. ৪৩

www.amarboi.org

দৈবাৎ কোন ঘটনা নয়। এটি সব পরিবারেই হয়ে থাকে, হওয়াটা স্বাভাবিক। এ সময় স্ত্রী তার স্বামীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং এমনসব বাক্য প্রয়োগ করে যা আপত্তিকর, শ্রুতিকটু ও মানহানিকর। এ অবস্থায় স্ত্রীর কোন আচরণেই স্বামীর রেগে যাওয়া উচিত নয়; বরং তা সহ্য করাই তার কর্তব্য। মহানবী (স.) নিজে স্ত্রীর এমন আচরণ সয়ে নিয়েছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। এমন অবস্থায় কখনও তিনি তাদেরকে শাসন করেননি; বরং সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। স্ত্রীদের কোন একজন মহানবীর সাথে রাগারাগি করে তাকে সকাল থেকে রাত অবধি সঙ্গ দেয়া থেকে বিরত থাকেন।[৩০৮] তবুও তিনি তাঁকে মারধর করেননি। একবার হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী তাঁর সাথে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। ওমর (রা.) বলেছিলেন, তুমি আমার মত ব্যক্তির কথার ওপর কথা বলছ? স্ত্রী বললেন, মহানবীর স্ত্রীরাও তাঁর কথার ওপর কথা বলত। আর তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৩০৯]

একবারের ঘটনা। মহানবী (স.) ও হযরত আয়িশা (রা.)-এর মধ্যে বাদানুবাদ চলছিল। এক পর্যায়ে আয়িশার পিতা হযরত আবু বকর (রা.) তাদের দু'জনের মধ্যে মিলমিশ করে দেয়ার জন্য সালিস-বিচারক হিসেবে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) আয়িশাকে বললেন, তুমি আগে বলবে না আমি বলব? হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, আপনিই বলুন। তবে সত্য ছাড়া কিছু বলবেন না। এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) মেয়েকে থাপ্পর মারলেন। এতে তার মুখ থেকে রক্ত বের হয়। আবু বকর (রা.) বললেন, ওহে নিজের প্রতি সীমালঙ্ঘনকারী আয়িশা! আল্লাহ্র রাসূল (স.) কি কখনও সত্য ছাড়া কিছু বলেন? অতঃপর আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহর কাছে চলে যান এবং তাঁর পেছনে আশ্রয় নেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তখন আবু বকর (রা.) কে বললেন, আমি আপনাকে এজন্য ডাকিনি এবং আপনার কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশা ছিল না।[৩১০]

---

৩০৮. প্রাগুক্ত

৩০৯. প্রাগুক্ত

৩১০. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

আরেকবারের ঘটনা। হযরত আয়িশা (রা.) একবার রেগে গিয়ে মহানবী (স.)-কে বলেছিলেন, انت الذى تزعم انك نبى؟ 'আপনি নবী, এজন্য নিজেকে কি মনে করেন? এ কথা শুনে নবীজী হেসে ফেলেছিলেন এবং এরকম খোঁচা মারা কথাও তিনি সহনশীলতা এবং ভদ্রতার খাতিরে মানিয়ে নেন।[৩১১] মহানবী (স.) আয়িশা (রা.) কে বলতেন যে, তুমি আমার প্রতি যখন সন্তুষ্ট থাক তখন আমি বুঝতে পারি, আবার যখন রাগান্বিত থাক, তখনও বুঝতে পারি। যদিও তুমি তোমার চাল-চলনে তা প্রকাশ কর না। হযরত আয়িশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তা কিভাবে বুঝতে পারেন? নবীজী বললেন, যখন তুমি সন্তুষ্ট-হৃষ্টচিত্ত ও উৎফুল্ল থাক, তখন কথা বলার সময় বল, না; মুহাম্মদের প্রভুর শপথ। আর যখন রেগে থাক, তখন বল, না; ইবরাহীম (আ.) এর প্রভুর শপথ। আয়িশা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শুধু আপনার নামটাই উচ্চারণ করা থেকে বাদ দেই, হৃদয়ে আপনি সর্বদাই জাগরুক থাকেন।[৩১২]

স্ত্রীর সাথে নম্র আচরণ করা

নম্র আচরণ মানুষকে কাছে টানে। নম্রতা বা বিনয় গুণ মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলে। এটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে অটুট রাখতে সহায়তা করে। শাসন দিয়ে যা করা যায় না নম্রতা দিয়ে হয়তো তা সম্ভব। হযরত আনাস (রা.) বলেন, মহানবী (স.) স্ত্রী ও বাচ্চাদের প্রতি ছিলেন সবচেয়ে বেশি দয়ালু।[৩১৩] হযরত ওমরের মত বীরপুরুষ ও কঠোর স্বভাবের লোকও বলতেন, পুরুষ তার ঘরোয়া জীবনে অবোধ বালকতুল্য হওয়া উচিত। হযরত লুকমান হাকীমও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যার আকল-বুদ্ধি আছে সে তার পরিবারে বাচ্চাদের মত হওয়া উচিত অর্থাৎ পরিবারের অভ্যন্তরীণ স্ত্রীর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করা বা কোন ধরনের কঠোরতা আরোপ করা বা সর্বদা শাসনের ওপর রাখা উচিত নয়।

---

৩১১. প্রাগুক্ত

৩১২. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৯৭-৮৯৮

৩১৩. ইহইয়াউ উলূম আল দীন, খ. ২, পৃ. ৪৩

www.amarboi.org

হাদীসের বর্ণনা- 'জাওয়াজ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'-এর 'জাওয়াজ' শব্দের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে নিজের পরিবারের প্রতি কঠোর হৃদয়সম্পন্ন এবং আত্মঅহংকারী।[৩১৪] কুরআন মাজীদের বাণীর অংশ 'ওতললিন'[৩১৫] শব্দের অর্থেও কেউ কেউ বলেছেন, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় পরিবারের সাথে মুখে শক্ত-কর্কশ ও মন্দ ভাষা প্রয়োগ করে এবং কঠিন হৃদয়সম্পন্ন।[৩১৬] একজন গ্রামীন মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছিলেন, 'তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করতেন, তখন থাকতেন হাসি খুশি, বাইরে গেলে চুপচাপ চলে যেতেন, যা পরিবেশন করা হত, তাই খেতেন, যা শেষ হয়ে যেত সে নিয়ে আর কোন প্রশ্ন তুলতেন না।[৩১৭] সুতরাং ঘরোয়া জীবনে নমনীয় ও রাহমাহ-দয়ার্দ্র হয়ে চলা স্বামীর জন্যই কল্যাণকর।

ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা অবলম্বন

গৃহকর্তা হিসেবে স্বামীর ভদ্রতা, নম্রতা, হাসি-খুশি, আনন্দ-উল্লাস ও স্ত্রী-পরিজনের মনোরঞ্জন যেন স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে এমন পর্যায়ে না হয়, যাতে স্ত্রী কোন বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে বা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে যায়, স্বামীর মর্যাদার পতন ঘটে; বরং সর্বক্ষেত্রে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলবেন। স্ত্রীকে মনোরঞ্জনের নামে কোন অন্যায় কাজে তিনি কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। স্বামীর নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ চলা ফেরার স্বাধীনতা কোন স্ত্রীর জন্যই শোভন নয়। বৈবাহিক বন্ধনের অর্থ হল স্ত্রী বা স্বামী কেউই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়; একটি বন্ধনে তারা আবদ্ধ ও একজন অন্যজনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

পারিবারিক জীবনে স্বামী যেহেতু অভিভাবক-কর্তা ব্যক্তি[৩১৮] এবং

---

৩১৪. প্রাগুক্ত

৩১৫. আল-কুরআন, ৬৮ঃ১৩

৩১৬. ইহইয়াউ উলূম আল দীন, খ. ২, পৃ. ৪৩

৩১৭. প্রাগুক্ত

৩১৮. আল-কুর'আন, ৪ঃ৩৪

www.amarboi.org

সায়্যিদ[৩১৯]-প্রধান ব্যক্তি, তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব তার। স্ত্রীর যাবতীয় আর্থিক দায়ভার বহন করাটা স্বামীর জন্য যতটা গুরুত্বের, তাকে অন্যায়-অপকর্ম ও অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য। স্বামীর খামখিয়ালী বা অসতর্কতার কারণে বা স্বামীর অন্যায় আবদার রক্ষা করতে গিয়ে স্ত্রী একবার কোন কুকর্মে জড়িয়ে গেলে, সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মহানবী (স.) এর নীতি- 'প্রত্যেক মানুষকে স্ব স্ব স্তরে মর্যাদা দাও'[৩২০]-এর অনুকরণে স্ত্রীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবন যাপন করতে হবে। কাজেই অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা স্বামীর কর্তব্য এবং সর্বাবস্থায় সত্য-ন্যায়ের অনুসরণ করা উচিত।

স্ত্রীর বয়স, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী তার সব চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করে তাকে নিয়ে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা স্বামীর কর্তব্য। অর্থাৎ কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিদেরকে আদর-যত্ন ও শাসন দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে। নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে যেন একটি পরিবারে অশান্তি নেমে না আসে সে দিকে স্বামীকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে স্ত্রীর স্বভাব চরিত্র বুঝে স্বামী তার সাথে সমন্বয় করে নেবে। আর এ সমন্বয়ের জন্য যা যা করা দরকার স্বামী তা-ই করবে শরী'আতের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে।

স্ত্রী অশিক্ষিত হলে তাকে শিক্ষাদান

স্ত্রী অশিক্ষিত হলে তাকে ইসলামের বুনিয়াদী-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা স্বামীর দায়িত্ব। পবিত্রতা কি, কখন মানুষ অপবিত্র হয়, পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি, নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত সম্পর্কিত জরুরী বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া স্বামীর দায়িত্ব এবং শিখে নেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে

---

৩১৯. আল-কুর'আন, ১২ ঃ ২৫

৩২০. মিশকাতুল মাসাবীহ্, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২৪

www.amarboi.org

দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও।[৩২১] তাই ইসলামের বিধি-নিষেধ কেবল নিজে পালন করাই যথেষ্ট নয়, পরিবারকেও তা পালন করাতে হবে। এজন্য স্বামী দীন পালনে অপরিহার্য বিষয়গুলো প্রয়োজনে নিজে সরাসরি শিখাবে, নিজে না পারলে কারোর মাধ্যমে তাকে শিখাবে।

প্রয়োজন হলে স্ত্রীকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে হলেও শিখাবে। এ ক্ষেত্রে কোন রকম বাধা দেয়া, বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা স্বামীর জন্য উচিতও নয়, বৈধও নয়। জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট পাক-নাপাক, হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা, হক-নাহক ইত্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য যদি স্ত্রী কোন পাপের ভাগী হয়, তবে সেই পাপের অংশিদারী স্বামীকেও হতে হবে। কুরআন ও হাদীসের যেসব বিধান কেবল নারীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং তাদেরকেই তা পালন করতে হয়, সেগুলো সম্পর্কে স্ত্রীকে অভিহিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারা, সূরা আন নিসা, সূরা আন নূর, সূরা আল আহযাব, সূরা আত তালাক, সূরা আত তাহরীম, সূরা আল মুমতাহিনা প্রভৃতি সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তুর অধিকাংশই মহিলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলোর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেয়া ছাড়া সুষ্ঠু দাম্পত্য ও পবিত্র জীবনের অধিকারী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

কারোর একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেকের সাথে সমান আচরণ করা

অনিবার্য কারণবশত কেউ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য হলে সেক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে শর্তসাপেক্ষে তা করার অনুমোদন দিয়েছে। সমাজ স্বীকৃত বৈধ কোন কারণ ছাড়া একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রচলিত আইনে প্রথম স্ত্রীর পূর্বানুমতি নেয়াকে এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক স্ত্রী নিয়েই শান্তি-সুখের জীবন গড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। তারপরও যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে সেক্ষেত্রে ইসলাম প্রত্যেকের প্রতি সমান আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। জীবন যাত্রার

---

৩২১. আল-কুর'আন, ৬৬ ঃ ৬

www.amarboi.org

মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক স্ত্রীকে আর্থিক সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। একইভাবে দৈহিক মিলনের দাবী পূরণেও সবাইকে সমান দৃষ্টিতে রাখতে হবে। এ দু'টি ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্য প্রদর্শন পারিবারিক অশান্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে।

স্বামী কোন ভ্রমণে স্ত্রীদের কাউকে সাথে নিতে চাইলে তা নির্ণয় করবে লটারির মাধ্যমে। মহানবী (স.) তাই করেছিলেন।[৩২২] চুলচেরা সমতা রক্ষা করা হয়তো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও যতদুর সম্ভব সমতা রক্ষা করে চলার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। কারো প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ে অন্যাকে সম্পূর্ণরূপে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা বা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা মারাত্মক অন্যায়।[৩২৩] একপেশে স্বামীর পরকালে করুণ পরিণতির কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তবে মনের দিক দিয়ে-ভালবাসার দিক দিয়ে সমতা বিধান করা অসম্ভব ব্যাপার। তাই কাউকে বেশি এবং কাউকে কম ভালবাসলে দোষের কিছু নেই। মহানবী (স.) আর্থিক সুবিধাদি ও সঙ্গ দানে সমতা রক্ষা করে আল্লাহ্র কাছে বলতেন, 'হে আল্লাহ্! আমি আমার সাধ্যমত সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আর আমার সাধ্যাতীত ব্যাপারে, যার মালিক একমাত্র তুমি অর্থাৎ মনের টান ও ভালবাসার ব্যাপারে সমতা রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই।'[৩২৪] মহানবী (স.) এর কাছে হযরত খাদিজা (রা.) এরপর হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়। আর এটা তাঁর সব স্ত্রীই বলতেন। এজন্য হযরত হাফসা (রা.) এর কিছুটা হিংসা হত। হাফসার পিতা ওমর (রা.) ব্যাপারটি জানতে পেরে মেয়েকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, তুমি ইবন আবু কুহাফা অর্থাৎ আবু বকরের (রা.) মেয়ে আয়িশাকে নিন্দা করবে না। কেননা আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহর ভালবাসা এবং তিনি নিজ মেয়ে হাফসাকে মহানবী (স.) এর সাথে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হতেও সাবধান করলেন।'[৩২৫]

---

৩২২. ইহইয়াউ উলূম আল দীন, খ. ২, পৃ. ৪৪

৩২৩. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১২৯

৩২৪. ইহইয়াউ উলূম আল দীন, খ. ২, পৃ. ৪৮

৩২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

www.amarboi.org

স্ত্রীকে মার-ধর করা থেকে বিরত থাকা

স্ত্রীকে মার-ধর করা পুরুষের বর্বর আচরণের বহিঃপ্রকাশ। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ীর লোকজন, যাদের মধ্যে পুরুষ নারী উভয়ই রয়েছে, কারণে অকারণে ঘরের বউয়ের গায়ে হাত তুলে থাকে। এ বর্বর ও হিংস্র আচরণ সচ্ছল অসচ্ছল, উঁচু-নিচু সব পরিবারেই দেখা যায়। শহরের চেয়ে গ্রামে বউ পেটানোর হার বেশি। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এর হার কম হলেও একেবারে নেই তা বলা যায় না। উচ্চবিত্তদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিলে, প্রতিবাদ করলে স্ত্রীকে মার-ধর করা হয়।

নারীর প্রতি অসম্মান, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, অনীহা, সুশিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক টানা পোড়ন, বেকারত্ব, অপরিচ্ছন্ন জায়গায় বসবাস, সংযম ও ধৈর্যের অভাব ইত্যাদি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার কারণ। সর্বোপরি ক্রোধ থেকে এ আচরণ করে। ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে মারপিটের মাধ্যমে তা মেটায়। অনেক সময়, ড্রাগ বা মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীকে পেটায়। এছাড়া রয়েছে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা। ইসলামে বউকে পরিচালনা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর অপব্যাখ্যা করে কেউ কেউ স্ত্রীকে মারধর করে। কারণ যাই হোক স্ত্রীর ওপর এ নির্যাতন, সহিংসতা ও মারপিটের অবসান একান্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিধানের ব্যাখ্যা সবিস্তারে আলোচনা করা হল।

পবিত্র কুরআনে স্ত্রীদের দু'দলে বিভক্ত করা হয়েছে। তাদের একদল হচ্ছে সতী-সাধ্বী ফরমাবরদার এবং অপরদল হচ্ছে অবাধ্য আচরণকারিণী, নাফরমান। প্রথমোক্ত স্ত্রীগণ সৎ নিষ্ঠাবান, নিজ নিজ স্বামীর প্রতি আনুগত্যশীল, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী রক্ষাকারী, স্বামীর অধিকারসমূহ যথার্থরূপে পালনকারিণী। তারা নিজেদেরকে অশ্লীলতা ও মন্দকর্ম থেকে রক্ষা করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতেও তার সম্পদ অপচয় বা নষ্ট করে না; বরং তা যথার্থরূপে হেফাযত করে। তারাই হচ্ছে আমানতদার, পূতপবিত্র,

www.amarboi.org

শ্রেষ্ঠ এবং অধিক মর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী। হাদীসের ভাষায় এই মহীয়সী স্ত্রীগণই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।[৩২৬]

আরেক প্রকার স্ত্রীদের অবস্থা হচ্ছে, তারা সীমালঙ্ঘন করে, অবাধ্য, স্বামীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত, অহংকারী ও স্বামীর আনুগত্য থেকে বিমুখ। এরূপ স্ত্রীদের সংশোধনের যুক্তিসঙ্গত, পরিবর্তনে সহায়ক ও মানবিক উপায় অবলম্বনের জন্য মানুষকে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের কতিপয় বাণী প্রণিধানযোগ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'পুরুষগণ নারীদের কর্তা-অভিভাবক-পরিচালক এই জন্য যে, আল্লাহ্ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য-মর্যাদা দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব নেককার স্ত্রীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদোপদেশ দাও, তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা কর। এতে কাজ না হলে মিলন-শয্যায় তাদেরকে ত্যাগ কর। আর (শেষ উপায় হিসেবে) তাদেরকে মৃদুপ্রহার কর। যদি তাতে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের ওপর অন্যায়-অত্যাচারের নতুন কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে আন্তরিকভাবে সমস্যার সমাধান চাইলে আল্লাহ্ তাদের উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।[৩২৭]

উপরিউক্ত আয়াত দু'টি সাদ ইবন রবী ও তার স্ত্রী হাবীবা বিনতে যিয়াদ এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। সাদ ছিলেন একজন প্রথম সারির সাহাবী। তিনি

---

৩২৬. সুনানে নাসাঈ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭১

৩২৭. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৪-৩৫

www.amarboi.org

এবং তার স্ত্রী দু'জনেই আনসারী মুসলিম ছিলেন। ঘটনাটি ছিল, হাবীবা তার স্বামীকে মানতে অস্বীকার করে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করে। এতে স্বামী তাকে চপেটাঘাত করে। অতঃপর হাবীবার পিতা তাকে নিয়ে মহানবীর কাছে গেল এবং বলল, আমার আদরের মেয়েটিকে তার সাথে ঘর সংসার করতে দেই আর সে কিনা তাকে চপেটাঘাত করেছে। মহানবী (স.) বললেন, অবশ্যই এই মেয়ে তার স্বামীর চপেটাঘাতের বদলা নিবে। হাবীবা স্বামীর চপেটাঘাতের বদলা নিতে পিতার সাথে রওয়ানা হল। এরই মধ্যে আয়াতটি নাযিল হল। তখন মহানবী (স.) বললেন, তোমরা ফিরে আস। জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আমার কাছে এসেছে যে, পুরুষগণ স্ত্রীদের ওপর কর্তৃত্বকারী-পরিচালক ও অভিভাবক। অতপর মহানবী (স.) বললেন, আমি যা চেয়েছিলাম মহান আল্লাহ্ এর অন্যটি চাইলেন। আর আল্লাহ্ যা চান, তাই উত্তম। এতে বদলা নেয়ার নিয়ম রহিত হল।

ইসলামে দু'টি ন্যায়সঙ্গত কারণ ও বিশেষ তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে পুরুষকে নারীর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত। আর তা হচ্ছে তার পুরুষ হওয়া। আল্লামা যামাখশারী (রহ.) পরিবারের কর্তা পুরুষ হওয়ার অনুকূলে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। পরিপক্ক জ্ঞান-বুদ্ধি, তীক্ষ্নতা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, শক্তি-সামর্থ্য, তাদের মধ্য থেকে নবী-রাসূল হওয়া, ইমামতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, জিহাদ, আযান, ইকামাত, জুমু'আর খুৎবা দান, আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, উত্তরাধিকারে বেশি অংশের মালিক হওয়া, বিয়ে-শাদীতে অভিভাবকত্ব করা, সন্তানাদি পিতার বংশে পরিচিত হওয়া ইত্যাদি।[৩২৮] এসব কারণে পুরুষগণ স্ত্রীদের ওপর কর্তৃত্বশীল ও পরিচালক হয়ে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করা স্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়। দৈবাৎ

---

৩২৮. মাহমূদ ইবন ওমর আল-যামাখশারী, *আল কাশশাফ আন হাকয়িকিত তানযীল ওয়া 'উয়ূনিল আকাবীল ফী উজূহিত তা'বীল*, (বাইরুত : দারুল মারিফাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ২৯০

www.amarboi.org

কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র। সুতরাং শরী'আতসম্মত কোন কিছুর নির্দেশ দেয়া বা শরীআত গর্হিত কোন কিছু থেকে নিষেধ করা, শৃঙ্খলা ও শালীনতা বজায় রাখার অধিকার তার রয়েছে। একটি পরিবারের সংরক্ষণ, প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণটি নিজের অর্জিত-এখতিয়ারাধীন। অর্থাৎ পুরুষ নিজের সম্পদ দিয়ে পরিবারের যাবতীয় আর্থিক ব্যয়-ভার বহন করে থাকে এবং তা করা তার ওপর অবশ্য কর্তব্য। পুরুষকে পরিচালক ও অভিভাবক মেনে নিয়েই একজন নারীর বিয়ে সম্পন্ন হয়। কারণ নারী যখন বিয়ের সময় নিজের ভরণ-পোষণ ও মোহরানার শর্তে বিয়ের প্রতি নিজের সম্মতি বা অনুমতি ব্যক্ত করে, তখন সে তার অর্থাৎ পুরুষের এ অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েই তা ব্যক্ত করে। এমনিভাবে পুরুষ ও কনের সব দায়িত্ব বহনের সুদৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। কাজেই স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা বা মেনে চলার বিষয়টি একদিকে যেমন স্বাভাবিক ও সাংবিধানিক তেমনি তা দায়-ভার বহনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

বস্তুত এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। তা হল দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সব বিষয়ে অধিকারের সমতা বিধান সত্ত্বেও স্ত্রীর ওপর স্বামীর অভিভাবকসুলভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। স্ত্রী স্বামীর পরিচালনাধীন। এই মূলনীতির ভিত্তিতে পরিবারের ছোট-খাটো ভুল-ভ্রান্তি, বিবাদ, মনোমালিন্য ও বিরোধ স্বামী হিসেবে নিজেই সংশোধন করে নিবে। তৃতীয় কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ সেখানে প্রয়োজন নেই। এজন্য উক্ত আয়াতে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ পর্যায়ক্রমে অবলম্বন করেই তাকে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্ত্রীকে বুঝানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কোনভাবেই বুঝানো সম্ভব না হলে তাকে একই বিছানায় নিয়ে রাত যাপন করবে; কিন্তু দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকবে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, শয্যায় ত্যাগের অর্থ হচ্ছে, একই বিছানায় তাকে বর্জন করবে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে শোবে এবং দৈহিক মিলন

www.amarboi.org

থেকে বিরত থাকবে।[৩২৯] তাতেও যদি স্ত্রী সংশোধন না হয়, তবে শেষ চেষ্টা হিসেবে কষ্টদায়ক নয়; অপমানজনক হালকা প্রহার করবে। এই প্রহার যেন নির্যাতনের পর্যায়ে না যায় সেজন্য কি দিয়ে প্রহার করবে, কি পরিমাণ করবে, কোথায় করবে ইত্যাদি বিষয়ের নিখুঁত ব্যাখ্যা মহানবী (স.) দিয়েছেন। সেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কারণ, কুরআনের বিধানের ব্যাখ্যা মহানবী (স.) যা করেছেন তা-ই যথার্থ ও সঠিক। বিধান বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকেই দিয়েছেন।[৩৩০] মহানবী (স.) বলেন, যদি তারা অশ্লীলতা, অবাধ্যাচরণ করে, তবে তাদের মৃদু প্রহার কর, হালকা শাসন কর; যা শুধু অপমানজনক হয়, কষ্টদায়ক না হয়।[৩৩১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এবং আতা (রা.) বলেছেন, হালকা প্রহার হচ্ছে মিসওয়াক দিয়ে মৃদু আঘাত। কাতাদাহ (রা.) বলেছেন দাগহীন আঘাত।[৩৩২] আব্দুল্লাহ ইবন যামাআতা (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (স.) বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসদের মারার মত না মারে এবং মারার পর দিনের শেষে তার সাথে যেন মুজামাআত না করে।[৩৩৩]

ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসটি যে অনুচ্ছেদে নিয়েছেন, এর নামকরণ করেছেন 'স্ত্রীদের প্রহার করা মাকরূহ-অপছন্দনীয় হওয়ার অনুচ্ছেদ'। এতেও বুঝানো হয়েছে যে, স্ত্রীকে প্রহার করা সাধারণভাবে অনুমোদিত নয়; ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদন থাকলেও তা অশোভন থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং

---

৩২৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন* (তাফসীরে কুরতুবী), বাইরুত : দারুল হাদীস আল-কাহিরা, ১৯৯৬/১৪১৬), খ .৫, পৃ. ১৭১

৩৩০. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৪, ৫৯ : ৭

৩৩১. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৪

৩৩২. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়ায়ি'উল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন*, (সিরিয়া : মাকতাবা আল-গাযালী, ১৯৮০/১৪০০), খ. ১, পৃ. ৪৬৯

৩৩৩. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৭৮৪

www.amarboi.org

প্রহারের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও যদি তা না করে ধমক দিয়ে বা অন্য কোন কৌশলে শোধরানো যায়, তাহলে সেটাই হবে সর্বোত্তম উপায়। মহানবী (স.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমাদের স্ত্রীদের স্বামীর ওপর কি কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন-যতবার যে মানের খাবার খাবে তাকেও ততবার সে মানের খাবার খাওয়াবে এবং তুমি যখন যে মানের কাপড় পরিধান করবে তাকেও সে মানের পোশাক-পরিচ্ছদ-অলংকারাদি পরিধান করাবে। স্ত্রীদের মুখমণ্ডলের ওপর আঘাত দেবে না, অকথ্য ভাষায় তাদের গালাগাল করবে না এবং নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রাখবে না।[৩৩৪]

তিনি আরও বলেন, তোমরা স্ত্রীদের প্রহার কর না, তাদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য নষ্ট কর না বা তাদের গালমন্দ কর না।' অন্যত্র বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র বাঁদীদের মার-ধর কর না।'[৩৩৫] লক্ষণীয় যে, স্ত্রীদেরকে এখানে আল্লাহ্‌র বাঁদী বলা হয়েছে; স্বামীর দাসী-বাঁদী বলা হয়নি। তাই তাদেরকে কারণে-অকারণে মার-ধর করার কোন অধিকার স্বামীর নেই। স্ত্রীর চেহারায় আঘাত করা, শরীরের কোথাও এমনভাবে প্রহার করা যাতে দাগ বসে যায়, হাড় ভেঙ্গে যায়, যন্ত্রণার সৃষ্টি করে ইসলামে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। শাসন বা সংশোধনের নামে স্ত্রীর প্রতি এরূপ নির্যাতনমূলক জঘন্য আচরণের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা কোন বাহাদুরীর কাজ নয়; বরং তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও হীন কাজ। স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাসম্ভব ক্ষমা করে দেয়া, তার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করাই যে অতি উত্তম তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা কোনভাবেই মহানুভবতার পর্যায়ে পড়ে না।

ফতোয়ায়ে কাযী খান-এ বলা হয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে সংশোধনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, স্বামীর ইচ্ছা ও নির্দেশ সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সাজ-সজ্জা

---

৩৩৪. হাদীসটি আসহাবুস সুনান বর্ণনা করেছেন। সূত্র, তাফসীরে ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৯২

৩৩৫. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯২

www.amarboi.org

পরিত্যাগ করে, স্বামী মিলনের ইচ্ছা পোষণ করলে তার হায়েয-নেফাসের মত কোন শরয়ী' কারণ থেকে পবিত্র থাকা সত্ত্বেও প্রস্তুত না হওয়া, স্ত্রী যদি ফরয নামায ছেড়ে দেয় এবং স্ত্রী যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়।[৩৩৬] ইমাম হালবী (রহ.) এর শারহুল মুনিয়া' গ্রন্থে রয়েছে, বিশুদ্ধ মতামত অনুযায়ী স্ত্রীকে শাসন করার দুটি কারণ রয়েছে, নামায ত্যাগ করা ও ফরয গোসল ত্যাগ করা।[৩৩৭]

বস্তুত এ অনুমতি পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্যই দেয়া হয়েছে। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব মেনে চলার মধ্যেই পারিবারিক সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নিহিত। কোন কারণে স্ত্রী স্বামী বিদ্বেষী হয়ে পড়লে সেই স্ত্রীকে পুনরায় স্বামীভক্ত করার চেষ্টা খোদ স্বামীকেই করতে হবে। বিদ্বেষী হওয়ার কারণ জেনে তা দূর করার চেষ্টা করবে। যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকলে তা সংশোধন করবে। স্বামীর নিজের কোন সংশোধনের প্রয়োজন হলে তাও তিনি অকপটে করে নিবে। নিজে সংশোধিত না হয়ে স্ত্রীকে তার অযৌক্তিক-অন্যায় মতামত মেনে নিতে বাধ্য করার অধিকার তার নেই। আবার স্ত্রীর রেগে যাওয়ার কারণ অযৌক্তিক হলে স্ত্রীকে যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিবে। বোঝানোর মাধ্যমেই যেন বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, স্বামীকে অবশ্যই সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে স্বামীকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কোন কঠিন অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত আবেগ বা ক্রোধ কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। যে করেই হোক নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে হবে।

ক্রোধ সংবরণের উপায়

মানুষ আবেগপ্রবণ। কিন্তু বাস্তবতায় অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা অর্থাৎ রাগ, ক্ষোভ কিংবা রোমান্সের অতি প্রকাশ একজন ব্যক্তির ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, সবাইকে পুরোপুরি আবেগহীন হয়ে

---

৩৩৬. বাযলুল মাজহুদ, খ. ৩, পৃ, ৪৪

৩৩৭. সহীহ আল-বুখারীর হাশিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৪

www.amarboi.org

যেতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে পরিমিত আবেগের প্রকাশ আবার অত্যন্ত জরুরী। পরিস্থিতি ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী এই পরিমিত আবেগের সংজ্ঞা ও সীমানা নিজেকেই তৈরি করতে হবে। দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক সহিংসতার পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীন ক্রোধ দায়ী হয়ে থাকে। রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে পারিবারিক কলহ এমনিতেই অনেকখানি কমে যায়। ক্রোধ সংবরণ করা, হজম করা, নিয়ন্ত্রণ করা মুমিন জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৩৩৮] হাদীসে ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলা হয়েছে, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।[৩৩৯] কারণ এ সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব সহজ ব্যাপার নয়; অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ক্রোধ দমনে কুরআন ও হাদীসে যেসব উপায় বলা হয়েছে তা হল-

এক. কোন কারণে ক্রোধ হলে সাথে সাথে সে পড়বে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম (আমি আল্লাহ্‌র কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কোন কুমন্ত্রণা-ষড়যন্ত্র টের পান, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন।'[৩৪০] হযরত সুলাইমান ইবন মুরাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (স.) এর সামনে দুই ব্যক্তি একে অপরকে গালাগালি করছিল। আমরা মহানবীর পাশেই বসা ছিলাম। তাদের একজন অন্যজনকে রাগান্বিত হয়ে চেহারা লাল হয়ে যাওয়ার অবস্থায় গালি দিচ্ছে। (দু'জনের কেউ শান্ত হচ্ছিল না।) তখন মহানবী (স.) বললেন, আমি অবশ্যই এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা পাঠ করে, তবে অবশ্যই তার ক্রোধ দূর হয়ে যাবে। বাক্যটি হল, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।'[৩৪১]

---

৩৩৮. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৩৪

৩৩৯. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০৩

৩৪০. আল-কুর'আন, ৪১ ঃ ৩৬

৩৪১. মুত্তাফাকুন আলাইহি, সূত্র, মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১২-২১৩

www.amarboi.org

দুই. ওযু করা। হযরত আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন, আমি একবার কোন প্রয়োজনে উরওয়া ইবনে মুহাম্মদের নিকট গেলাম। কোন কারণে উরওয়া উত্তেজিত ও রেগে গেল। আবু ওয়ায়েল বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পানি নিয়ে ওযু করে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। তারপর বলেন, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, ক্রোধ শয়তানের কাজ এবং শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি। আর আগুন পানিতে নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রেগে যায়, তখন সে যেন অবশ্যই ওযু করে নেয়।[৩৪২] বস্তুত ক্রোধের সময় শরীর গরম হয়ে যায়, চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে, হাত-পা শরীর কাঁপতে থাকে।

আর এসবই আগুনের ধর্ম-শয়তানের কারসাজি। কাজেই ক্রোধের সময় ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযু করলে মানুষের রাগ আস্তে আস্তে কমে যায় আর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে তা একেবারেই দূর হয়ে যায়। কারণ নামায হচ্ছে আত্মসমর্পণের শ্রেষ্ঠ উপায়। কেউ যখন নিজেকে স্রষ্টার সামনে পূর্ণাঙ্গভাবে সমর্পণ করে তখন তার মধ্যে আর ক্রোধ থাকতে পারে না। সাধারণত মানুষ তার প্রতিপক্ষ যখন দুর্বল বা সমমানের হয় তখনই রেগে যায়। সবলের সামনে কেউ রাগ প্রদর্শন করতে যায় না।

তিন. ক্রোধের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। মহানবী (স.) বলেন, তোমাদের কেউ রেগে গেলে আর তখন দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে। এতে যদি রাগ প্রশমিত না হয় তাহলে শুয়ে পড়বে।[৩৪৩] এরপর আর কিছুতেই ক্রোধ থাকতে পারে না। সাধারণত দেখা যায়, কোন মানুষ রেগে গেলে তার মধ্যে তেজদীপ্ততা দেখা যায়, প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। সে শুয়া অবস্থায় থাকলে বসে যায় এবং বসা থাকলে দাঁড়িয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ক্রোধের স্বভাবগত দাবীই এটা যে, ক্রোধ অবস্থায় শুয়া থাকলে বসে যাওয়া এবং বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া। অতএব এর বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ ক্রোধের

---

৩৪২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩৪

৩৪৩. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩২

www.amarboi.org

সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে যাওয়া এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়া অবশ্যই ক্রোধ দমনের কার্যকর ব্যবস্থা।

চার. স্থান পরিবর্তন করা। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, কারো প্রতি ক্রোধ আসার সাথ সাথে উক্ত স্থান ত্যাগ করলে ক্রোধ আপনা থেকেই অবদমিত হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ ক্রোধ প্রকাশের ক্ষেত্র ও কারণ সামনে উপস্থিত না থাকলে ক্রোধের প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর আপনি তাদের কথায় ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে ভদ্রতার সাথে এড়িয়ে চলুন, বর্জন করম্নন।'[৩৪৪]

পাঁচ. সর্বোপরি ক্রোধ দমনের দৃঢ় ইচ্ছা মনে পোষণ করতে হবে। ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।[৩৪৫] আল্লাহ্ সহনশীল, তাই মানুষকেও সহনশীল হতে হবে। আল্লাহ্র রহমত সবসময়ই তার গজব-ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়।[৩৪৬] উন্নত স্বভাবের লক্ষণ হচ্ছে, রাগান্বিত হয়েও অপরকে ক্ষমা করতে পারা।[৩৪৭] তাছাড়া যে কোন মন্দ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সর্বোত্তম পন্থায় সামাল দেয়া কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা সবচেয়ে সুন্দর উপায়ে (পরিস্থিতি) মোকাবেলা কর।'[৩৪৮] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, এ সুন্দর উপায় হল, ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ এবং কারোর মন্দ আচরণেও ক্ষমা করতে পারা।'[৩৪৯] সুতরাং ক্রোধ যেন কাউকে সীমালঙ্ঘনের দিকে না নিয়ে যায়। বিশেষ করে স্ত্রী নির্যাতনের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। রাগের মাথায় পারিবারিক কোন সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকাও বাঞ্ছনীয়। স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের সংযত আচরণ করা উচিত, যাতে অনভিপ্রেত ঘটনার সৃষ্টি না হয়।

---

৩৪৪. আল-কুর'আন, ৭৩ : ১০

৩৪৫. আল-কুর'আন, ২ : ১৩৮

৩৪৬. আল-কুর'আন, ৭ : ১৫৬ ও মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৭

৩৪৭. আল-কুর'আন, ৪২ : ৩৭

৩৪৮. আল-কুর'আন, ৪১ : ৩৪

৩৪৯. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩৪

www.amarboi.org

নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন-যাপন করা

ইসলামী বিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা স্বভাবসম্মত ও প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ জন্য দাম্পত্য ও পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারী প্রকৃতির দিকে খেয়াল রেখে জীবন-যাপনের প্রতি নির্দেশ রয়েছে ইসলামে। স্ত্রীর প্রকৃতিগত এক মৌলিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে মহানবী (স.) বলেন, 'স্ত্রীগণ সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি জীবনভর স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, আর কোন এক সময় যদি সে তার মর্জি-মেজাজের বিপরীত কোন ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায়, তাহলে তখনই বলে ওঠে, আমি তোমার কাছে কোনদিনই ভাল কিছু দেখতে পাইনি।'[৩৫০] মহানবী (স.) এর এ বাণী থেকে একদিকে যেমন স্ত্রীর একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেল, তেমনি এটি স্বামীর জন্য এক বিশেষ সাবধান বাণীও বটে। স্বামী যদি এটিকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, তাহলে কোন সমস্যা থাকে না। আর যদি তা মানতে না পারে, তবে পারিবারিক জীবনে অতি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেয়। এ জন্য স্বামীর অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্যের প্রয়োজন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, নারীরা পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। অর্থাৎ তারা জন্মগতভাবেই একটু বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোর করে তাকে সোজা করতে যাও, তবে তুমি তাকে চূর্ণ করে দেবে। আর যদি তাকে নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য ও মধুময় উপভোগ্য জীবন লাভ করতে চাও, তবে তার স্বভাবগত ও জন্মগত প্রকৃতি বক্রতাকে যথাযথভাবে থাকতে দিয়েই তাকে নিয়ে সুমধুর পারিবারিক জীবন গড়ে তোল।' অন্যত্র তিনি আরও বলেন, তোমরা নারীদের ব্যাপারে উত্তম উপদেশ গ্রহণ কর। অর্থাৎ নারীদের ব্যাপারে আমি তোমাদের কিছু ভাল উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তাদের ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা, তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের বাঁকা অংশটি হচ্ছে তার উপরের অংশ। অতএব তুমি যদি ওটা

---

৩৫০. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮২-৭৮৩

www.amarboi.org

সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর ছেড়ে দিলে বাঁকাই থেকে যাবে। আমি আবারও বলছি, তোমরা স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ কর।'[৩৫১]

হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মহানবী (স.) মূলত নারীকে পাঁজরের হাড়ের সাথে তুলনা করেছেন মাত্র। অর্থাৎ পাঁজরের হাড় দৃশ্যত বাঁকা; কিন্তু তার এ বক্ররূপেই তাকে মানায়। এটাই তার সৌন্দর্য। এমনিভাবে নারীর চারিত্রিক বক্রতাই তার স্বাভাবিকতা এবং সৌন্দর্য বহন করে। মহানবী (স.) এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম নারীদের-স্ত্রীদের মর্যাদার প্রতি এতটাই সচেতন ছিলেন যে, তাদের সাথে খুব হিসাব করে কথা বলতেন। তাদের অধিকার আদায়ে সর্বদা সতর্ক থাকতেন।[৩৫২]

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদের মূল কারণই এটা যে, স্বামী চায় স্ত্রীর সব ভাবনা তার মত হোক আবার স্ত্রী চায় তাকেই অনুসরণ করুক তার স্বামী। অথচ স্বামী পুরুষসুলভ আলাদা একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং স্ত্রী নারীসুলভ একটি ভিন্ন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দু'টোকে এক করে ফেলা কোনভাবেই সম্ভব নয়; বরং দুয়ের মধ্যে সমঝোতা ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা যায় মাত্র। এ সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে দম্পতি যত বেশি সফল তাদের পারস্পরিক বন্ধন ততবেশি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দাম্পত্য জীবনে অনাবিল শান্তি বিরাজ করবে।

নারীদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে মহানবী (স.) এর এসব উক্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারীদের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পুরুষদেরকে অত্যধিক সতর্ক ও সাবধান করে তোলা। ফলে পুরুষরা নারীদের সমীহ করে চলবে, তাদের মনস্তত্ত্বের প্রতি নিয়ত খেয়াল রেখেই তাদের সাথে আচার-ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এ কারণে পুরুষদের কাছে তারা

---

৩৫১. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭৯ এবং সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৫

৩৫২. সহীহ আল-বুখারীর হাশিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭৯

www.amarboi.org

অধিকতর প্রিয় হবে। এতে নারীর মর্যাদা ও সৌন্দর্যে যেন দৃষ্টান্তের সাহায্যে আরও বেশি মহিমান্বিত হল।

স্ত্রীর অভিমান সহ্য করা

স্ত্রীর কাছে স্বামী অত্যন্ত সম্মানের ও শ্রদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও সংসার জীবনে স্ত্রী কখনো কখনো এমন আচরণ করে থাকে যা স্বামীর মর্যাদার পরিপন্থী। স্ত্রীও তা জেনে-বুঝেই করে থাকে। আর এরূপ করার ভিত্তি হচ্ছে, স্বামীর সাথে মান-অভিমান প্রদর্শন করা, যা মোটেও দোষের নয়। ইফ্‌কের ঘটনায় মুনাফিকরা যখন হযরত আয়িশা (রা.)-এর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করল, আর এ নিয়ে প্রায় মাসাধিককাল হৈ চৈ চলতে থাকল, তখন একবার রাসূলুল্লাহ্ (স.) আয়িশাকে লক্ষ্য করে বললেন, আয়িশা! তুমি যদি সম্পূর্ণ নির্দোষ ও পূত-পবিত্র হয়ে থাক, তাহলে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই তোমার পবিত্রতার কথা জানিয়ে দিবেন। আর যদি তোমার পক্ষ থেকে কোন অন্যায় ঘটে থাকে তাহলে আল্লাহ্র দরবারে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা-ইসতিগফার করে নাও। এ কথার জবাব দিতে আয়িশা (রা.) তাঁর বাবা-মাকে বললেন।

তারা নিজেদের অপারগতার কথা বললে আয়িশা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি নিজেও জানি না, আপনার এ বক্তব্যের উত্তর কি দেব। যদি বলি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ্ জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ তবে তা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি বলি আমার ওপর আরোপিত অপবাদ সত্য, অথচ আল্লাহ্ জানেন আমি তা থেকে পবিত্র, তাহলে তা আপনারা গ্রহণ করে নেবেন। সুতরাং এ অবস্থায় আমি আপনাকে তাই বলব, যা ইউসুফের পিতা ইয়াকুব (আ.) বলেছিলেন, 'ধৈর্যই উত্তম, তোমরা যা বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহ্ আমার সাহায্যকারী।[৩৫৩] এ কথা বলে আয়িশা (রা.) বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছে ওহী নাযিলের

---

৩৫৩. আল-কুর'আন, ১২ : ১৮

www.amarboi.org

লক্ষণ দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরে যখন ওহী নাযিল শেষ হল, তখন প্রথম যে কথাটি রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তা হচ্ছে, হে আয়িশা! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তখন আয়িশা (রা.) এর মা বললেন, রাসূলুল্লাহর কাছে যাও, তাকে ধন্যবাদ জানাও, সালাম কর। হযরত আয়িশা বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দাঁড়াব না, সালামও করব না। আমি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই প্রশংসা করব না।[৩৫৪]

বাহ্য দৃষ্টিতে হযরত আয়িশার এ জবাবটি কিছুটা আপত্তিকর মনে হতে পারে। মহানবী (স.) এর মর্যাদার পরিপন্থী হতে পারে। কিন্তু মহানবী (স.) এতে সামান্যতম বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না। কারণ তিনি জানতেন যে, এটা ছিল তার সাথে আয়িশার মান অভিমান। আর স্ত্রী হিসেবে তিনি অভিমান করার অধিকার রাখেন। মূলত, স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্ক থেকেই অভিমানের সৃষ্টি হয়। আয়িশা (রা.) এর এই শক্ত জবাবের ভিত্তি অভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। আয়িশা (রা.) কখনো রেগে গেলে মহানবীর নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকতেন।

মহানবী (স.) আয়িশা (রা.) কে বলতেন যে, তুমি আমার প্রতি যখন সন্তুষ্ট থাক তখন আমি বুঝতে পারি, আবার যখন রাগান্বিত থাক, তখনও বুঝতে পারি। যদিও তুমি তোমার চাল-চলনে প্রকাশ না কর। হযরত আয়িশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তা কিভাবে বুঝতে পারেন? নবীজী বললেন, যখন তুমি সন্তুষ্ট-হৃষ্টচিত্ত ও উৎফুল্ল থাক, তখন কথা বলার সময় বল, না; মুহাম্মদের প্রভুর শপথ আর যখন রেগে থাক, তখন বল, না; ইবরাহীম (আ.) এর প্রভুর শপথ। আয়িশা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শুধু আপনার নামটাই উচ্চারণ থেকে বাদ দেই, হৃদয়ে আপনি সর্বদাই জাগরুক থাকেন।[৩৫৫] সুতরাং স্ত্রী হিসেবে রাগারাগি বা অভিমান করতেই পারে। স্বামীকে অবশ্যই তা সয়ে নিতে হবে।

---

৩৫৪. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯৮

৩৫৫. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৯৭-৮৯৮

www.amarboi.org

স্বামীর অধিকার ও স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য

স্বামীকে মেনে চলা

স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সে তার স্বামীকে মেনে চলবে। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয়, এর প্রধান হিসেবে ইসলাম স্বামীকে মনোনীত করেছে। স্ত্রী পরিজনসহ পরিবারের যাবতীয় দায়ভার বহন করা এবং সঠিক নেতৃত্ব ও পরিচালনার মাধ্যমে তা এগিয়ে নেয়ার মত কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য দৈহিক শক্তি, মানসিক দৃঢ়তা, জ্ঞান, সাহস, ধৈর্য, অর্থ উপার্জন ও তা ব্যয় করার উদার মানসিকতা দিয়ে অভিভাবকত্বের উপযোগী করে তাকে তৈরি করা হয়েছে। তাই যে স্বামী তার স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে, তাকে মেনে চলা, তার সন্তুষ্টি অজনের চেষ্টা করাকে ইসলাম স্ত্রীর ওপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'অতএব যারা নেককার-যোগ্য ও সৎচরিত্রসম্পন্ন স্ত্রী তারা স্বামীর অনুগত ও অনুরক্ত হয়ে থাকে।'[৩৫৬] স্বামীর অনুগত থাকা ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়টি স্ত্রীর জন্য এতই মৌলিক ও মুখ্য বিষয় যে, পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ-অকল্যাণ সবই যেন এর সাথে সম্পৃক্ত। স্ত্রী স্বামীকে মেনে চললে ও তার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকলে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে ওঠবে এবং পরকালে এমন স্ত্রী জান্নাত লাভে ধন্য হবে।[৩৫৭] হাদীসে স্বামীর অনুগত থাকাকে স্ত্রীর জন্য সালাত, সাওম ও নিজের সতীত্ব বজায় রেখে চলার মত অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, 'স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, নিজের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে, তবে সে অবশ্যই তার প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ

---

৩৫৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৪

৩৫৭. সুনান ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১৩৪

www.amarboi.org

করবে।[৩৫৮] ইসলামসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত স্বামীর আদেশ-নিষেধ না মানা, তার সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়া, তার কোন আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করা, হাতাহাতি পর্যায়ে চলে যাওয়া স্ত্রীর জন্য যেমন উচিত নয় তেমনি বৈধও নয়।[৩৫৯]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর চরম আনুগত্য ও পরম শ্রদ্ধা থাকবে-এটাই ইসলামের শিক্ষা ও নীতি। এই নীতি ও আদর্শ অনুসরণে যারা জীবন গড়বে, তারাই হবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ স্ত্রী। মহানবী (স.) বলেন, সর্বোত্তম স্ত্রী হচ্ছে সে, যখন তুমি তাকে দেখ তোমার মন আনন্দে ভরে ওঠে, যখন তুমি তাকে কোন আদেশ কর, সে তা পালন করে এবং যখন তুমি অনুপস্থিত থাক তখন তোমার ধন-সম্পদ ও তার ওপর তোমার যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করে।' অন্য এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞেস করা হল 'স্ত্রীদের মধ্যে কারা সর্বোত্তম ? তিনি বললেন, যখন সে তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে মোহিত করে, যখন সে কোন নির্দেশ দেয় সে তা পালন করে এবং স্ত্রীর নিজের ব্যাপারে এবং তার সম্পদের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে তা সে করে না।[৩৬০]

স্বামীর অনুগত থাকা স্ত্রীর জন্য যেমন কর্তব্য তেমনি এটি তার জন্য মর্যাদা ও মহত্ত্বেরও বটে। মহানবী (স.) বলেন, মুমিনের জন্য তাকওয়ার পর সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর হচ্ছে সৎ-যোগ্য স্ত্রী, যে স্বামীর কথা মেনে চলে, স্বামী তার দিকে তাকালে আনন্দিত হয়, স্বামী তাকে কোন বিষয়ে কসম দিলে সে তা রক্ষা করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে নিজের ও তার সম্পদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হয়।[৩৬১]

বস্তুত পারিবারিক জীবনে স্ত্রী যদি স্বামীর প্রাধান্য স্বীকার না করে, স্বামীকে

---

৩৫৮. ইবন হাব্বান, বাবু মু'আশারাতিয যাওজাইনি, হাদীস নং ৪১৫১

৩৫৯. তাফসীর রুহুল মা'আনী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৩-২৪,

৩৬০. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, *তাফসীর তাবারী শরীফ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৩৯

৩৬১. সুনান ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

www.amarboi.org

মেনে না চলে, স্বামীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি-সর্বাবস্থায় যদি সে স্বামীর কল্যাণ বিধানে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে দাম্পত্য জীবন শান্তিময় হয়ে ওঠতে পারে না। অবশ্য ইসলামে এ আনুগত্য শর্তহীন নয়। যাদের আনুগত্য করা যাবে না তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য কর না, যার অন্তরকে আমার যিক্‌র-স্মরণ থেকে বিমুখ করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।'[৩৬২] 'এবং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের আনুগত্য কর না-যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শান্তির পক্ষে কাজ করে না।'[৩৬৩] 'তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তার আনুগত্য কর না।'[৩৬৪] 'এবং অনুসরণ কর না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে চরমভাবে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণের কাজে বাধা দেয়, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাববিশিষ্ট, তদুপরি কুখ্যাত-জারজ।'[৩৬৫] আনুগত্যের এই শর্তাবলী ও সীমারেখা কর্তা ব্যক্তির মোকাবিলায় অধীনস্থদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের এক মজবুত গ্যারাণ্টি দান করে।[৩৬৬]

অনুগত থাকার বিশেষ কতিপয় দিক হচ্ছে,

ক) স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা না রাখা,

খ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে তার গৃহে প্রবেশ করতে না দেয়া,

গ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ থেকে কাউকে কোন কিছু না দেয়া।[৩৬৭]

---

৩৬২. আল-কুর'আন, ১৮ ঃ ২৮

৩৬৩. আল-কুর'আন, ২৬ ঃ ১৫১-১৫২

৩৬৪. আল-কুর'আন, ৭৬ ঃ ২৪

৩৬৫. আল-কুর'আন, ৬৮ ঃ ১০-১৪

৩৬৬. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, অনু, আবুত তাওয়াম ও মুহাম্মদ আবু নুসরত হেলালী, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী,১৯৯২), পৃ. ১৯৬

৩৬৭. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮২

www.amarboi.org

ঘ) স্বামী দৈহিক মিলনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে (যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়া) তাতে সম্মত থাকা। মহানবী (স.) বলেন, 'যখন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে আর স্ত্রী বিছানায় এসে স্বামীকে সঙ্গ দিতে অস্বীকার করে তবে ফেরেশতাগণ তাকে (স্ত্রীকে) লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সকাল হয়।'[৩৬৮]

ঙ) স্ত্রী তার মাসিক চলাকালীন সময় সম্পর্কে স্বামীকে সঠিক তথ্য জানাবে; এ বিষয়ে কোন তথ্য গোপন করার কারণেও স্বামী-স্ত্রীতে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হতে পারে।

চ) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কারো সন্তুষ্টি অর্জনের সেরা মাধ্যম হতে পারে। এ বিষয়টি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের তা পছন্দ করেন। অর্থাৎ এতে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।'[৩৬৯] পারিবারিক শান্তি ও পরকালে জান্নাত লাভের জন্য যেহেতু স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন একান্ত প্রয়োজন, তাই স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা স্ত্রীর জন্য একান্ত কর্তব্য।

এই একটিমাত্র গুণের অভাবে পরকালে অধিকাংশ স্ত্রী জাহান্নামী হবে বলে হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, 'আমি জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হলাম। অতঃপর দেখা গেল, তাদের অধিকাংশই হল মহিলা-স্ত্রী জাতি। এ কথা শুনে স্ত্রীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন হওয়ার কারণ কি ? রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, কারণ তারা বেশি বেশি অভিশাপ দেয় এবং স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'[৩৭০]

ছ) স্বামীর অপছন্দের কাউকে তার বিছানায় শোতে না দেয়া। মহানবী (স.) বলেন, 'তাদের ওপর তোমাদের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা এমন কোন

---

৩৬৮. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৪

৩৬৯. আল-কুর'আন, ৩৯ ঃ ৭

৩৭০. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৩

www.amarboi.org

ব্যক্তিকে তোমাদের বিছানায় শুতে দেবে না, যাকে তোমরা মোটেও পছন্দ কর না।[৩৭১]

জ) স্বামীর অনুমতি ছাড়া সম্পদ কাউকে দিবে না এবং তার গৃহ ছেড়ে কোথাও যাবে না। মহানবী (স.) বলেন, 'স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সংসারের কোন কিছুই তুমি দান-খয়রাত করবে না, যদি স্ত্রী এমনটি করে তবে দানের পুণ্য স্বামীই পাবে এবং স্ত্রী এজন্য গোনাহগার হবে। আর স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বসতবাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না।'[৩৭২]

ঝ) অপরাধ কিছু হয়ে গেলে এজন্য অনুতপ্ত হবে। মহানবী (স.) বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কারা জান্নাতি হবে, তাদের বিষয়ে কি আমি তোমাদেরকে অবহিত করব? তারা হচ্ছে সেসব স্ত্রী, যারা প্রেমময়, অধিক সন্তানবতী ও স্বীয় স্বামীর ওপর অভিমানী; যখন সে কষ্ট দেয় বা নিজেই কষ্ট পায় তখন স্বামীর কাছে চলে আসে; এমনকি স্বামীর হাত ধরে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন কিছুরই স্বাদ গ্রহণ করব না।[৩৭৩]

ঞ) তার সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করা। মহানবী (স.) বলেন, কোন স্ত্রী মারা গেলে আর তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৭৪]

ঘরের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বজায় রাখা

স্ত্রীর ওপর স্বামীর এটি একটি মৌলিক অধিকার। সংসার জীবনের প্রতিটি বিষয়েই স্ত্রী দায়িত্বশীল। তার প্রতি স্বামীর যে আস্থা-বিশ্বাস তা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে। 'আল্লাহ্ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন

---

৩৭১. জামে' তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯

৩৭২. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৮

৩৭৩. ইমাম তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সূত্র মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খ. ৪ পৃ. ৩১৩

৩৭৪. সুনান ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৪

www.amarboi.org

লোকচক্ষুর অন্তরালেও তারা এর হেফাযত করে।[৩৭৫] এই হেফাযতযোগ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে,

(ক) স্ত্রীর নিজের ইজ্জত-সম্মান ও সতীত্বের সংরক্ষণ। ঘরে-বাইরের গাইরে মুহাররাম সব পুরুষের কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা, নিজের সৌন্দর্যকে মুহাররাম পুরুষ ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ না করা, অশালীন পোশাক পরে অহেতুক বাইরে ঘুরে বেড়ানো থেকে বিরত থাকা এবং পর পুরুষের সাথে সংযতভাবে কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি

(খ) স্বামীর সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ করা। তার সম্পদ অপচয় বা বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকা এবং তা সংরক্ষণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা। তার সম্পদ চুরি করা, কাউকে দিয়ে দেয়া বা আত্মসাৎ করা মারাত্মক অন্যায়।

(গ) বংশ সংরক্ষণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر- তাদের জন্য এটা মোটেও বৈধ নয় যে, তাদের গর্ভে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, তারা তা গোপন করবে, যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে।'[৩৭৬] তিনি আরও বলেন, 'আর তারা জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না।'[৩৭৭]

(ঘ) ঘরোয়া জীবনের শৃঙ্খলা, পূত-পবিত্রতা, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ও সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড তথা মদ, জুয়া ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখা। ঘরে প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করা বিশেষ করে ফজরের পূর্বে, দুপুরে যখন বিশ্রাম নেয়া হয় এবং এশার নামাযের পর। উপরন্তু নামায, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহ্র যিক্র, জ্ঞানের চর্চা, নৈতিক প্রশিক্ষণ, নির্দোষ বিনোদন, হাসি-আনন্দ, গল্প-রসিকতা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গঠনমূলক ও প্রয়োজন কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে ঘরের মর্যাদা ও

---

৩৭৫. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৩৭৬. আল-কুর'আন, ২ : ২২৮

৩৭৭. আল-কুর'আন, ৬০ : ১২

www.amarboi.org

সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তোমরা আপন ঘরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ্ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। আল্লাহ্র বিধানসমূহ ও জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের ঘরে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।'[৩৭৮] 'আল্লাহ্ যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে এমন ব্যক্তিগণ (অবস্থান করেন) যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।'[৩৭৯]

ঙ) স্বামীর গোপনীয় বিষয়াদি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর সবচেয়ে কাছের মানুষ। স্বামীর বিষয়াদি সম্পর্কে স্ত্রীর পক্ষে যতটুকু জানা সম্ভব পৃথিবীর দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তির পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তাই স্বামী সম্পর্কে তার মর্যাদার পরিপন্থী কোন কথা বলা, গোপন তথ্য প্রকাশ করা, তাকে হেয় করা বা তার সম্পর্কে অসংলগ্ন কথা বলা অন্যায়। হযরত নূহ (আ.) এর স্ত্রী ও হযরত লূত (আ.) এর স্ত্রীর উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তারা দু'জনই আমার দুই নেক বান্দার স্ত্রী ছিল। তারা দু'জন নিজ নিজ স্বামীর সাথে খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'[৩৮০] হাদীসে আছে, নূহ (আ.) এর স্ত্রীর খিয়ানত ছিল এই কথা বলা যে, তার স্বামী নূহ (আ.) হচ্ছেন পাগল। (অথচ তিনি ছিলেন আল্লাহ্র নবী এবং

---

৩৭৮. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৩৩-৩৪

৩৭৯. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩৬-৩৭

৩৮০. আল-কুর'আন, ৬৬ ঃ ১০

www.amarboi.org

সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক।) আর লূত (আ.) এর স্ত্রীর খিয়ানত ছিল লোকজনকে তাঁর মেহমান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া (লূত আ. এর সময়ে লোকজন সমকামিতার দোষে দুষ্ট ছিল। তাঁর কাছে ভদ্রলোকদের আগমন ঘটলে আর এ খবর তারা জানতে পারলে আগত মেহমানদের ওপরও তারা পশুর ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ত)।[৩৮১] কাজেই স্বামী বা স্ত্রীর মানহানি হয় এমন কোন বিষয় প্রকাশ করা থেকে স্বামী বা স্ত্রী উভয়কেই বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

ছেলে-মেয়ে ও ঘরোয়া সব বিষয়ে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দান

ছেলে-মেয়ে ও ঘরোয়া সব বিষয়ে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব করার এক গুরু দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে সে শতভাগ স্বাধীনভাবে সবকিছু পরিচালনা করবে। তারই কর্তৃত্বে ঘরের সব ব্যাপার সম্পন্ন হবে। ঘর-সংসার ও ছেলে-মেয়েদের তত্ত্বাবধানের মূল দায়িত্ব স্ত্রীর। মহানবী (স.) বলেন এবং স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও তার সন্তানদের অভিভাবক'[৩৮২] অর্থাৎ দু'টি বিষয়ে স্ত্রীকে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রহ.) বলেন, বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে, স্ত্রী কল্যাণময় সব কাজ-কর্মে স্বামীর সাহায্যকারী হবে। তার খাদ্য ও পানীয় তৈরি করণ, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারে সে হবে যিম্মাদার। অর্থ-সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও সন্তানদের লালন-পালন করবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সংসারের যাবতীয় বিষয়ে স্থলাভিষিক্ত হয়ে তা পরিচালনা করবে।[৩৮৩]

ঘর-সংসার ও সন্তানাদি সম্পর্কিত বিষয়াদি সংরক্ষণ করা, সুষ্ঠু পরিচালনা করা একজন মহিলার প্রধান দায়িত্ব। এ কঠিন দায়িত্ব পালনে যতটা কর্তৃত্বের প্রয়োজন ইসলামী বিধানে তাকে তার শতভাগ কর্তৃত্ব দেয়া আছে।

---

৩৮১. তাফসীর জালালাইন এর হাশিয়া, (সিঙ্গাপুর : এদারায়ে নশর ওয়া এশা'আতে ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৪৬৬

৩৮২. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৩

৩৮৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, বাবু হুকুকুয যাওজাতি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৮

www.amarboi.org

গৃহজগতের সব বিষয়ে স্ত্রী হচ্ছে রাণী-সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারিণী। এখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। শরী'আতের সীমালঙ্ঘন ছাড়া ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে ও নিজের প্রয়োজনে স্বামীর সম্পদের ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয় করাতে কোন প্রশ্ন তোলার সুযোগ কারো জন্যই রাখা হয়নি। যার সম্পদ স্বয়ং তাকেও এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলতে বারণ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, গৃহে একজন মুসলিম পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে মেহমানের মত।

ঘরোয়া বা স্ত্রীর নেতৃত্বাধীন বিষয়ে পুরুষের হস্তক্ষেপকে ইসলাম অত্যন্ত নীচ-হীন ও নিন্দনীয় বিষয় বলে বিবেচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে মহনবী (স.) এর সেই বাণীকে স্মরণ করতে হয় যেখানে তিনি বলেছেন, 'স্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বলতে কোন কিছু নেই (অর্থাৎ তার কাজের কোনটি উত্তম কোনটি মন্দ তা নয়; বরং সবই মূল্যায়নযোগ্য।) আর তাদের ধৈর্যের কোন অবকাশ নেই। অর্থাৎ তারা সবকিছুই রয়ে-সয়ে করবে এরও কোন দরকার নেই। তারা ভদ্রলোকের (স্বামীর) ওপর মাতবরী করে বিজয়ী হয়েই জীবন যাপন করবে। পক্ষান্তরে ইতর ও অসভ্য প্রকৃতির লোকেরা (স্বামীরাই) তাদের ওপর মাতবরী করে তাদেরকে পরাজিত করে সংসার করে থাকে। সাংসারিক জীবনে পরাজিত ভদ্রলোক হয়ে থাকতেই আমি পছন্দ করি। অভদ্র বিজয়ী ব্যক্তি হওয়াকে আমি মোটেও পছন্দ করি না।[৩৮৪] সুতরাং গৃহ অভ্যন্তরে ভদ্রলোকদের একটিই করণীয়, আর তা হচ্ছে ঘরোয়া ব্যাপারে স্ত্রীর নেতৃত্বের-কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয়া, মেনে নেয়া এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

স্বামীর ঘর কার্যত স্ত্রীর নিজের ঘর। পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী আবহমান কাল থেকে স্ত্রীরা সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম সামাল দিয়ে আসছে। কখনও নিজের হাতে সব কাজকর্ম সম্পন্ন করছে। কখনও কাজের লোক দিয়ে তা করিয়ে নিচ্ছে। নিজের ঘরের কাজ নিজে করা কোন স্ত্রীর জন্যই অপমান বা লজ্জার কারণ হতে পারে না। আভিজাত্যের দোহায় দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে অলস জীবন পার করা কারোরই কাম্য

---

৩৮৪. তাফসীর জালালাইন এর হাশিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

www.amarboi.org

নয়। সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের কিছু না কিছু নিজে করার মধ্যে এক ধরনের আনন্দও রয়েছে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন যে, স্বামী খুব বেশি ধনী ব্যক্তি না হলে স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে তার ঘরের কাজ যতদূর সম্ভব নিজের হাতে সম্পন্ন করা; স্ত্রী যতবড় ধনী বা অভিজাত ঘরের কন্যাই হোক না কেন।

কুরআনের বাণী, 'স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেমন অধিকার আছে, স্বামীর ওপর স্ত্রীর তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে'[৩৮৫] প্রমাণ করে যে, স্বামী যেমন স্ত্রীর জন্য প্রাণপাত কষ্ট করে, স্ত্রী হিসেবে তারও কর্তব্য স্বামী, সংসার ও সন্তানের প্রয়োজনে কিছু কাজ করা। ইমাম ইবন তাইমিয়া, আবু বকর ইবন শাইবা ও আবু ইসহাক অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। হাদীসে আছে, মহানবী (স.) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.) এর ওপর তাঁর সংসারের অভ্যন্তরীণ সব বিষয় সমাধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং আলী (রা.) এর ওপর দিয়েছিলেন ঘরের বাইরের সব কাজের দায়িত্ব।[৩৮৬] হযরত ফাতিমা (রা.) নিজেই ঘরের সব কাজ করতেন। চাক্কি বা যাতা চালিয়ে গম পিষতেন, নিজে রুটি তৈরি করতেন। এতে তাঁর কষ্টও কম হত না। এ নিয়ে তিনি পিতার কাছে একবার অভিযোগও পেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁকে ধৈর্যের উপদেশ দেন এবং কাজের প্রতিই উৎসাহিত করেন।

শারীরিক সুস্থতা, মানসিক দৃঢ়তা ও আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনে কাজের কোন বিকল্প নেই। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। ভাগ্য ফিরাতে মানুষকে জীবনে পরিশ্রম করেই যেতে হয়। এটি প্রকৃতির নিয়ম। 'মানুষ তাই পায়, যা পাইতে সে চেষ্টা করে।'[৩৮৭] স্ত্রী সাধারণত অধিক সময় গৃহে অবস্থান করে। নিয়মিত কিছু কাজ না করলে তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। চাকুরি জীবন থেকে অবসরে গিয়ে অনেককে অসুস্থ হয়ে যেতে দেখা যায়। কারণ অবসরে দৈহিক শক্তি ও

---

৩৮৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৮

৩৮৬. মাহাসিনুত তাবীল, খ. ৩, পৃ. ৫৮৫

৩৮৭. আল-কুর'আন, ৫৩ ঃ ৩৯

www.amarboi.org

মনোবল হ্রাস পেতে থাকে। তাই চাকর-চাকরানী থাকলেও কিছু কাজ নিজের হাতে করাই শ্রেয় অর্থাৎ একটি পরিবারের সামগ্রিক দায়-দায়িত্বের অর্ধেক স্বামী ও অর্ধেক স্ত্রীকেই পালন করতে হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলে পরিবারের শান্তি-সমৃদ্ধি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বামীর ঘরে স্ত্রী নির্যাতনের ধরন ও এর প্রতিরোধে গৃহীত ইসলামের বিধান

শারীরিক নির্যাতনের ধরন ও প্রতিকার

নির্যাতিত নারীদের অধিকাংশই স্বামীর ঘরে নির্যাতনের শিকার হয়। স্বামীর ঘরে স্ত্রী সাধারণত শারীরিক ও মানসিক দু'ভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে কারণে-অকারণে মার-ধর করা, যৌতুকের জন্য অত্যাচার করা, ন্যায্য খাওয়া-পরা থেকে বঞ্চিত করা, গর্ভপাত ঘটানো, স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের সময় নিয়মবিধি অমান্য করে মিলিত হওয়া, যৌন ক্ষুধা নিবৃত করা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

মার-ধর করা

স্বামী বা শ্বশুরালয়ের যে কারো কর্তৃক কারণে-অকারণে স্ত্রীকে মার-ধর করা, চড়-থাপ্পর-কিল-ঘুষি মারা, স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালের সাথে আঘাত করা, লাথি মেরে ফেলে দেয়া, জ্বলন্ত সিগারেট গায়ে চেপে ধরা, কোন কিছু আগুনে উত্তপ্ত করে গায়ে চেপে ধরা, লাঠি-ছুটা দিয়ে বেদম প্রহার করা, সজোরে মুখ চেপে বা গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করা, খামচি দিয়ে বা কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত বা রক্তাক্ত করা, এসিড মেরে ঝলসে দেয়া, কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া বা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়া ইত্যাদি সবই শারীরিক নির্যাতন। এই ধরনের দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে গৃহবধূরা। পান থেকে চুন খসতেই গৃহস্বামী শাসনের নামে স্বামীত্বের বাহাদুরী দেখাতে স্ত্রীর ওপর এরূপ অত্যাচার করতে থাকে। শহর, বন্দর, গ্রাম, গঞ্জ প্রায় সব জায়গায় স্ত্রীকে

www.amarboi.org

মার-ধর করা বর্তমানে মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারো ঘরে বউ হয়ে যাওয়ার অর্থই যেন স্বামী বা শ্বশুরালয়ের শত অত্যাচার চোখ বুঁজে সহ্য করার অঙ্গিকার করা। অথচ ইসলাম স্বামীর ঘরে স্ত্রীর মর্যাদাকে সর্বোতভাবে সমুন্নত করেছে।

শ্বশুরালয়ের কেউ স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবে থাক দূরের কথা স্বয়ং স্বামীও স্ত্রীকে মার-ধর করতে পারবে না। স্ত্রীকে মার-ধর করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীদের প্রহার কর না এবং তাদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য নষ্ট কর না বা তাদের গাল-মন্দ কর না।'[৩৮৮] তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্বীয় স্ত্রীকে এমন নির্মমভাবে মার-ধর না করে যেমন করে তোমরা মেরে থাক তোমাদের ক্রীত দাস-দাসীদেরকে। অতঃপর দিনের শেষে তার সাথে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হয়।'[৩৮৯] মার-ধরকারী স্বামীর কবল থেকে স্ত্রীকে মুক্ত করতে মহানবী (স.) তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হাবীবা বিনতে সাহল নামে এক মহিলা সাবিত ইবন কায়িস ইবন সামশ এর স্ত্রী হয়ে ঘর করছিল। সাবিত তাকে খুব মার-ধর করার ফলে তার গর্ভপাত ঘটে যায়। রাত পেরিয়ে সকাল হলে হাবীবা মহানবীর দরবারে চলে আসল এবং তাঁর কাছে স্বামীর মার-ধরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, বিচার দাবী করল। অতঃপর মহানবী (স.) সাবিতকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি হাবীবাকে যে সম্পদ দিয়েছ তার কিছু অংশ নিয়ে নাও এবং হাবীবাকে তোমার বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটাই কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তিনি বললেন, হ্যাঁ। সাবিত বলল, আমি তাকে মোহরানা বাবদ দুটি বাগান দিয়েছি এবং এ দুটিই তার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তখন মহানবী (স.) বললেন, তুমি এ দুটিই নিয়ে নাও এবং তাকে (হাবীবাকে) মুক্ত করে দাও। সাবিত তাই করলেন।'[৩৯০]

---

৩৮৮. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯২

৩৮৯. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৪

৩৯০. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৩

www.amarboi.org

স্বামীর ঘরে স্ত্রী নির্যাতনের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে যৌতুক। লোভী স্বামী যৌতুকের জন্য তার স্ত্রীকে উত্যক্ত করতেই থাকে। এ জন্য স্ত্রীকে মার-ধর করা, বাপের বাড়িতে তাড়িয়ে দেয়া, তালাক দেয়া এমনকি স্ত্রীর খুন হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। যৌতুক ছাড়া বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কোন বিয়ে হয় না। দাবীকৃত যৌতুক দিতে ব্যর্থতার মানেই হল স্ত্রীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। এ কুপ্রথা বন্ধের জন্য যুগোপযোগী আইন রয়েছে। কিন্তু শুধু আইনের মাধ্যমে এ অশুভ প্রথাকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামের সুমহান আদর্শের অনুসরণ, যা মানুষের মধ্যে অবচেতনে যে সত্য ও সুন্দর ঘুমিয়ে আছে, তা জাগিয়ে তোলে। বিবেকের তাড়নায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন মানুষ তা বর্জন করবে এবং স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে, কেবল তখনই স্বামীর পরিবারে স্ত্রীর যথার্থ মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। যৌতুক নেয়া আর অন্যের সম্পদ বাতিল পন্থায় অন্যায়ভাবে গ্রাস করা একই কথা। কোন মুমিন-মুসলিম তা করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না।'[৩৯১]

ন্যায্য খাওয়া-পরা তথা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বিরত থাকা

স্ত্রীকে ন্যায্য খাওয়া-পরাও ভোগ বিলাস থেকে বঞ্চিত করা পারিবারিক পর্যায়ে গৃহ অভ্যন্তরে নির্যাতনের একটি করুণ দিক। স্ত্রীকে দিনে-রাতে এক বেলা খেতে দেয়া বা তাকে উচ্ছিষ্ট-নিকৃষ্ট খাবার খেতে বাধ্য করা মারাত্মক অন্যায়। ইসলামী আইন বিধানে এরূপ অন্যায়-অত্যাচারের নিন্দা করা হয়েছে এবং গোটা মানবতাকে তা পরিহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ খরচ কর-ভোগ-ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয়-ভোগ করতে মনস্থ কর না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না। তবে

---

৩৯১. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৯

www.amarboi.org

যদি চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও (সেটা স্বতন্ত্র কথা)।'[৩৯২] অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা হচ্ছে নিজের জীবন ধারণে উৎকৃষ্ট বস্ত্রসামগ্রি গ্রহণ করা, তবে ঠেকায় পড়ে নিকৃষ্ট কিছু গ্রহণ করলে সেটা অন্য কথা।

সুতরাং পরিবারের পুরুষ সদস্যদের খাওয়া-পরার যে মান রক্ষা করা হয়, অনুরূপ খাওয়া-পরা থেকে কোন স্ত্রীকে বঞ্চিত করা তার প্রতি নির্যাতনেরই শামিল। এরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতন থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করতে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ 'আর সন্তানের পিতার ওপরে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের (স্ত্রীদের) ভরণ-পোষণ অবশ্য কর্তব্য।'[৩৯৩] অর্থাৎ পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ দৈনিক যে কয়বার যে মানের খাবার খেয়ে থাকেন ততবার সে মানের খাবার একজন নারীর-স্ত্রীর গ্রহণ করারও স্বীকৃত অধিকার রয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল প্রয়োজন পূরণের বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রয়োজন পূরণ ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন কর না।'[৩৯৪] তাই বৈষম্য নয়, স্ত্রীকে সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়াকে ইসলাম পুরুষ তথা স্বামীর ওপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

গর্ভপাত

স্ত্রীর জীবনের নানা অঘটনের মধ্যে একটি হচ্ছে গর্ভপাত। প্রাক-বিবাহ বা বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে গর্ভের সঞ্চার হলে, ধর্ষিতা হয়ে অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ ঘটে গেলে, বিবহিত জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতা, দৈহিক মিলনের আনন্দে ব্যাঘাত হবে বলে বা জন্মনিরোধক ব্যবহারের সুযোগ না থাকা, অধিক সন্তান হলে অভাব-অনটন হওয়ার ভয়

---

৩৯২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৬৭

৩৯৩. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩৩

৩৯৪. আল-কুর'আন, ৬৫ ঃ ৬

www.amarboi.org

ইত্যাদি করণে সাধারণত গর্ভপাত ঘটানো হয়। প্রতিহিংসা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের লোভ বা শত্রুতা করেও এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০২-এ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বছরে ৮ কোটি অনিচ্ছাকৃত বা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ হয়। বলা বাহুল্য এই অবাঞ্ছিত জন্মরোধ করতে বেছে নিতে হয় গর্ভপাতকে।[৩৯৫] এত অধিক সংখ্যক গর্ভপাত ঘটাতে প্রতিদিন বিভিন্ন অনিরাপদ পদ্ধতি ও পরিবেশে গর্ভপাতের প্রচেষ্টা চলে। এভাবে অনিরাপদ ও অসম্পূর্ণ গর্ভপাতের ফলে শুধু ভ্রূণ নয়, প্রাণ দিতে হয় মাকেও। বেঁচে গেলেও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে অথবা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে মা হওয়ার সব সম্ভাবনা।

গর্ভপাতের বৈধতা দেয়া বা অবৈধ ঘোষণা করা নিয়ে সারা পৃথিবীতে রয়েছে নানা মত।[৩৯৬] তবে ইসলামে এর সাধারণ কোন স্বীকৃতি নেই। ইসলামী আইনে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বার বার গর্ভপাত ঘটানো, গর্ভের সঞ্চার হয়ে গেলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চার হয়ে যাওয়ার পর গর্ভপাত ঘটানো সম্পূর্ণ হারাম। এ কাজ কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ এতে একটা জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ সত্তা হত্যা করা হয়। যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ[৩৯৭] ছাড়া কোন অসৎ উদ্দেশ্যে গর্ভপাত ঘটানো শরী'আতে হারাম। এতে যেমন ভ্রূণ নষ্ট হয় তেমনি একজন নারীর জীবন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এভাবে হাতে ধরে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে নিষেধ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের হাতে নিক্ষেপ কর না।'[৩৯৮] 'তোমরা

---

৩৯৫. দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা, ২৮ নভেম্বর, ২০০০ খ্রী.

৩৯৬. বিস্তারিত দ্র. গাজী শামসুর রহমান, ইসলামী আইনের ভাষ্য, পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৮ খ্রী.

৩৯৭. যেমন স্ত্রীর জীবন বাঁচাতে, দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রয়োজনে, স্বামী বা স্ত্রী রোগাক্রান্ত হওয়া, স্বামী বা স্ত্রী বিদেশে বা সফরে থাকা ইত্যাদি।

৩৯৮. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৯৫

www.amarboi.org

নিজেরাই নিজেদের হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতি দয়াবান। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন, অন্যায়-অত্যাচারের বশবর্তী হয়ে এরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটাবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।'[৩৯৯]

মাতৃত্বেই নারীত্বের পূর্ণতা অর্জিত হয়। সন্তান ধারণ ও জন্মদানের স্রষ্টা প্রদত্ত স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে স্ত্রীকে মর্মজ্বালায় নিক্ষেপ করা কোন স্বামীর জন্যই বৈধ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে স্ত্রী সম্ভোগের অনুমতি দানের পাশাপাশি সন্তান কামনারও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর যেভাবে তোমরা চাও; আর নিজেদের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আশা কর।'[৪০০] অন্য আয়াতে তিনি আরও বলেন, 'অতএব এখন তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সহবাস করতে পার; আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই তোমরা সন্ধান কর-সন্তান লাভ করতে আগ্রহী হও।'[৪০১] সন্তানের জনক-জননী হওয়া মানুষের জন্য চিরকালই গৌরবের বিষয়। মানুষের প্রতি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ দান এটি। জোরপূর্বক গর্ভপাত ঘটিয়ে তা প্রতিরোধ করা কোন মানুষের জন্যই শোভনীয়-ন্যায়সঙ্গত ও আইনসিদ্ধ হতে পারে না। তাই এ ধরনের গর্ভপাতকে ইসলাম হারাম-সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে।

স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের সময় ও নিয়ম মেনে না চলা

স্ত্রীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় বা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করাও তার প্রতি এক ধরনের শারীরিক নির্যাতন। এটি হারাম-নিষিদ্ধ। এতে স্ত্রীর কষ্ট হয়, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর তারা আপনার কাছে হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা যাবে কি-না, সে ব্যাপারে জানতে চায়; আপনি বলুন, এটা কষ্টদায়ক, অসূচী-অপবিত্র। কাজেই

---

৩৯৯. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৯-৩০

৪০০. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৩

৪০১. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১২৭

www.amarboi.org

তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না-মিলিত হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।[৪০২] নারীর জীবনে মাসিক চলাকালীন সময়টি ও সন্তান প্রসব পরবর্তী সময়টি অতি কষ্টের ও ঝামেলাপূর্ণ সময়। এ সময় তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, বর্জন করা, আলাদা ঘরে থাকতে বাধ্য করে অসহায় করে দেয়া, জোরপূর্বক মিলিত হওয়া, তাকে দিয়ে ভারী কোন কাজ করানো, তার খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যত্ন না নেয়া-সবই নির্যাতনের শামিল। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদেরকে বর্জন করা তো দূরের কথা; বরং এ বিশেষ সময়ে স্ত্রীর পাশে থেকে তাকে সহানুভূতি দেখাতে এবং তার কষ্ট হয় এমন সব আচরণ থেকে বিরত থাকতে মহানবী (স.) বিশ্বমানবতাকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।[৪০৩]

স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তিমূলক স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হলে তা একটি ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য হবে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর দু'বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে। ইসলামী আইনেও জরিমানার বিধান রয়েছে। হায়েয-নেফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে সেই স্বামীর ওপর কাফফারা-আর্থিক দণ্ড ওয়াজিব বলে যেসব মুসলিম মনীষী রায় দিয়েছেন, তারা হলেন, ইবন আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (রা.), সাঈদ ইবন জুবায়ের (রা.), কাতাদহ (রা.), ইসহাক (রা.) এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)। হাসান বসরী (রা.) জরিমানা হিসেবে গোলাম আযাদ করার কথা বলেছেন এবং অন্যান্য মনীষীগণ এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা অর্ধ দীনার সদকা করার কথা বলেছেন। মহানবী (স.) এমন স্বামীর ব্যাপারে বলেছেন, 'সে যেন এক দীনার বা অর্ধ দীনার সদকা করে।'[৪০৪]

অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম শাফিঈ'

---

৪০২. আল-কুর'আন, ২ : ২২২

৪০৩. বিস্তারিত দ্র. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৫

৪০৪. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪

www.amarboi.org

(রহ.) এ হাদীসের হুকুমকে মুস্তাহাব পর্যায়ে রেখে শুধুমাত্র তওবা-ইস্তিগফার করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তবে নির্যাতনের মানসে হায়েয-নেফাস অবস্থায় বলপূর্বক যে স্ত্রী সহবাস করে এরূপ অত্যাচারী স্বামীর ওপর কাফফারা তথা আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধানই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, শাফেঈ' মতাবলম্বী মনীষীগণ বলেন, যদি কোন মুসলিম হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাসকে হালাল মনে করে মিলিত হয়, তবে সে কাফির বা মুরতাদ বলে গণ্য হবে। আর যদি হালাল মনে না করে ভুলে বা না জেনে বা জোরপূর্বক হয়ে থাকে, তবে কোন গুনাহ বা কাফফারা দিতে হবে না। আর যদি তা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকে, তবে সে বড় ধরনের অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে।[৪০৫] সুতরাং বৈধ সীমায়ও স্ত্রী যেন নির্যাতিত না হয়, সেজন্য ইসলাম স্বামীর ওপর অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করা থেকে বিরত থাকা

স্ত্রীর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলার আর একটি অপকৌশল হচ্ছে কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে শুধু শাস্তি ও যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকা। কুরআন হাদীসে এরূপ করাকে ঈলা বলা হয়। এর জন্য ইসলামী শরীআত সর্বোচ্চ চার মাস সময় বেধে দিয়েছে। স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে এ সময়ের মধ্যে সে তার স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে নেবে। অন্যথায় এ সময় অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন,

'যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে যাবে না বলে শপথ করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতপর যদি তারা (এ সময়ের মধ্যে পারস্পরিক) মিলমিশ করে নেয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেয়ারই সংকল্প করে তাহলে আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও জানেন।'[৪০৬] নির্যাতনের উদ্দেশ্যে এরূপ করা যে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় তাতে কোন সন্দেহ

---

৪০৫. সুনান আবু দাউদ, আত-তা'লীক আল-মাহমুদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৪

৪০৬. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৬-২২৭

www.amarboi.org

নেই। কারণ বৈবাহিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও সতীত্বের হেফাযত করা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। চার মাসের সময়সীমা বেধে দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষতির প্রতিরোধ করা। চার মাসের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে স্বামী যদি নিজের ইচ্ছা পরিবর্তন না করে ও শপথ না ভাঙ্গে তবে এ নির্ধারিত সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার স্ত্রী শরী'আতের নিয়ম অনুযায়ী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্ত্রীকে উপেক্ষা ও অবহেলা প্রদর্শনের এ-ই হচ্ছে উচিত শাস্তি।[৪০৭] এমনিভাবে যেখানে শপথ ছাড়া কেবল জ্বালাতনের উদ্দেশে সহবাস বর্জন করা হয়, সেখানেও সতীত্ব হেফাযতে সমস্যা দেখা দেয়ার কারণ পাওয়া যায় বিধায় 'ঈলা'র হুকুম প্রযোজ্য হবে।[৪০৮]

জোর করে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা

স্ত্রী নির্যাতনের আর একটি দিক হচ্ছে তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসা বা পতিতা বৃত্তি করিয়ে অর্থ উপার্জন করা, বন্ধুদের মনোরঞ্জন বা ব্যবসায়িক স্বার্থে স্ত্রীকে ব্যবহার করা, পার্টিতে নাচতে-গাইতে বাধ্য করা, স্ত্রী বদল করে আনন্দ করা ইত্যাদি। এসব কাজে ইচ্ছে করে কেউ কোন দিন যেতে চায় না। ব্যতিক্রম হয়তো আছে। তবে বেশির ভাগই পরিস্থিতির স্বীকার। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মোহান্ধ কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর খপ্পরে পড়ে ঘরে-বাইরে, হোটেল-রেস্তোরায় বহু সতী-সাধ্বী নারী দুর্বিসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে অগণিত নারীকে বিপথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের এ সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন ছাড়াও এইডস-এর মত মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। যারজ সন্তানের ভারে পৃথিবী কলঙ্কিত হচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে উল্লিখিত প্রতিটি কাজই ব্যভিচার বা ব্যভিচারের

---

৪০৭. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনু, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ২৮৭

৪০৮. আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুর'আন*, (বাইরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৩), খ. ১পৃ. ৭৫

www.amarboi.org

উদ্দীপক। কুরআন মাজীদে ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যাবে না। কারণ এটি অশ্লীল ও মন্দ পথ।'[৪০৯] অন্য আয়াতে আছে, 'আর তোমরা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না; তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনেই হোক।'[৪১০] অর্থাৎ যা কিছু অশ্লীল ও নির্লজ্জ তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনেই হোক না কেন ইসলামে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে, 'তোমরা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্য সব ধরনের অপরাধের-পাপের কাজ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয়ই যারা পাপের কাজ করে তাদের পাপ কাজের শাস্তি তাদেরকে অচিরেই দেয়া হবে।'[৪১১] সুতরাং যারা কুরআনে বিশ্বাসী তারা কখনই অশালীন প্রক্রিয়ায় স্ত্রীদেরকে দৃশ্যপটে আনবে না, আনতে পারে না।

স্ত্রীকে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করার প্রশ্নই ওঠে না। স্ত্রীর জন্য অবমাননার এ দেহ ব্যবসা প্রথা চিরদিনের জন্য ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের দাসী বা স্ত্রী কন্যাদের পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য কর না; যদি তারা পূত-পবিত্র থাকতে চায়।'[৪১২] বেশ্যাবৃত্তি বা দেহ ব্যবসা যেহেতু অত্যন্ত ঘৃণিত ও জঘন্য পাপের কাজ সেহেতু এর দ্বারা উপার্জিত টাকা যত সৎ-মহৎ বা প্রয়োজনীয় কাজেই বিনিয়োগ করা হোক, তা কিছুতেই সমর্থনীয় বা অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না; বরং এ কাজে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর কুর'আনে বর্ণিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের জন্য নির্ধারিত শাস্তি বা হদ প্রয়োগ করা সমাজের অপরাপর ব্যক্তিদের অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, এ জঘন্য পাপের কারণে পৃথিবীতে কোন অশান্তি, বা মহামারি বা দুরারোগ্য ব্যাধির বিস্তার ঘটলে এতে কেবল পাপের সাথে জড়িত ব্যক্তিরাই আক্রান্ত হবে না; নিরপরাধ মানুষও তাতে জর্জরিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা এমন

---

৪০৯. আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ৩২

৪১০. আল-কুর'আন, ৬ ঃ ১৫১

৪১১. আল-কুর'আন, ৬ ঃ ১২০

৪১২. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩৩

www.amarboi.org

বিপদ থেকে বেঁচে থাক, যা শুধুমাত্র তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরকই স্পর্শ করে না।'[৪১৩] এমনিভাবে পরপুরুষের সামনে স্ত্রীকে যৌন উত্তেজক, উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ হয়ে নাচতে-গাইতে বাধ্য করাও স্ত্রীর প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের শামিল। কারণ নারীর গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার নিমিত্তে সজোরে পদাঘাত করতেও ইসলামে নিষেধ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ولايضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 'তারা (নারীরা) যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।'[৪১৪]

নারীর সৌন্দর্যকে পুঁজি করে তাকে দিয়ে অশ্লীল ছবি, নাটক, গান, মডেলিং ইত্যাদি করিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা প্রকারান্তরে তাদের ওপর অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়। এমনিভাবে একজনের বিয়ে করা স্ত্রী অন্যের জন্য হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আর নারীদের মধ্যে যাদের স্বামী আছে, তারা তোমাদের জন্য হারাম।'[৪১৫] তাই বন্ধুদের মধ্যে একে অপরের স্ত্রীকে নিয়ে বিনোদন করার, ভোগ করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এরূপ জঘন্য অপরাধে যারা অপরাধী, তাদেরকে পবিত্র কুরআনে সীমালঙ্ঘনকারী, শাস্তিযোগ্য অপরাধী এবং কিয়ামতের দিন দিগুণ শাস্তি ভোগকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। –فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون 'আর যারা এদেরকে (নিজের বিবাহিত স্ত্রী) ছাড়া অন্যকে কামনা করবে, ভোগ করতে চাইবে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী।'[৪১৬] 'আর যে এ কাজ করবে, সে পাপী ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল স্থায়ী হবে।'[৪১৭] স্ত্রীর ইজ্জত হরণকারী, ব্যভিচারে বা দেহব্যবসায় বাধ্যকারী নরপশুদের শাস্তির কথা কুর'আন ও হাদীসের আরও বহু জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে।

---

৪১৩. আল-কুর'আন, ৮ ঃ ২৫

৪১৪. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩১

৪১৫. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৪

৪১৬. আল-কুর'আন, ২৩ ঃ ৭

৪১৭. আল-কুর'আন, ২৫ ঃ ৬৮-৬৯

www.amarboi.org

মানসিক নির্যাতনের ধরন ও প্রতিকার

শুধু দৈহিকভাবে কষ্ট দিলেই যে নির্যাতন হয়, তা নয়; বরং মানসিক নির্যাতনও একজন নারীকে-স্ত্রীকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তিরস্কার, গালমন্দ, অবহেলা, নিজের মতামত জোর করে স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা বাক স্বাধীনতা খর্ব করা, আতঙ্কিত করা, চাপের মুখে রাখা-এসবই মানসিক নির্যাতন।

গালমন্দ, তিরস্কার ও কঠোরতা আরোপ

ইসলাম যেখানে কোন অমুসলিমকেও গালি দিতে নিষেধ করেছে,[৪১৮] সেখানে নিজের স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া অচিন্তনীয়। কোন মুমিন-মুসলিমের জন্য গালি দেয়া অন্যায় ও পাপের কাজ বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।[৪১৯] স্ত্রীর প্রতি কর্কশ আচরণ বা কঠোর হৃদয়সম্পন্ন হওয়া কখনই শোভন হতে পারে না। এতে পারস্পরিক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।[৪২০] স্ত্রীকে ধমকানোও উচিত নয়। ইসলামে ভিক্ষককে পর্যন্ত ধমক দিতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪২১] স্ত্রীর বাপের বাড়ির প্রসঙ্গ তুলে তাকে তিরস্কার করা, কথায় কথায় ভরণ-পোষণের খোটা দেয়া ও তীর্যক মন্তব্য করা অন্যায়। পরিবারের ভরণ-পোষণ দেয়া একদিকে যেমন স্বামীর ওপর কর্তব্য অন্যদিকে তাতে দানের পুণ্যও অর্জিত হয়।[৪২২] খোটা দিয়ে তা নষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের দানসমূহকে খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে বাতিল করে দিও না।[৪২৩]

স্ত্রীকে তার বাবার বাড়িতে যেতে না দেয়া, আটকে রাখা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বন্দি জীবন যাপনে বাধ্য করার এখতিয়ার স্বামীর

---

৪১৮. আল-কুর'আন, ৬ ঃ ১০৮

৪১৯. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৯৩

৪২০. বিস্তারিত দ্র. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ১৫৭

৪২১. আল-কুর'আন, ৯৩ ঃ ১০

৪২২. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুন নাফাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০৫

৪২৩. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৬৪

www.amarboi.org

নেই। যৌতুক আদায় বা মোহারানা হিসেবে স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেয়ার কৌশল হিসাবে বা অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে স্বাভাবিক জীবন থেকে বারণ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) আটক রেখ না; যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীলতা করে তবে তা স্বতন্ত্র কথা।'[৪২৪] মহানবী (স.) বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'[৪২৫]

স্ত্রীর সবকিছুকেই অপছন্দ করার মানসিকতা পোষণ করাও স্বামীর জন্য উচিত নয়। মানুষ হিসেবে স্ত্রীর মধ্যে এমন অনেক গুণও রয়েছে, যা প্রশংসার যোগ্য। কারণ দোষে-গুণে মানুষ সৃষ্টি। স্ত্রীর গুণের দিকে তাকাতে বলা হয়েছে; দোষের প্রতি নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) অপছন্দ কর, তবে হয়তো এমন কিছুকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[৪২৬] মহানবী (স.) বলেন, কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম নারীর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না করে। কেননা, তার কোন একটি দিক বা চরিত্র তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক বা চরিত্র পছন্দ হবে।'[৪২৭] অর্থাৎ প্রতিটি নারীরই মানুষ হিসেবে দোষও আছে, গুণও আছে। এসব আয়াত ও হাদীসে স্ত্রীকে অবহেলা ও অপছন্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার ভাল গুণগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকে নিয়ে জীবন যাপন করার প্রতি বিশ্বমানবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

অপবাদ দেয়া বা দোষারোপ করা

পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী যেন অহেতুক কোন অপবাদের শিকার না হয়,

---

৪২৪. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৯

৪২৫. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮৫

৪২৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৯

৪২৭. ইমাম মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী, রিয়াদুস সালেহীন, (দেওবন্দ : মাকতাবা মোস্তফাই, তা. বি.), খ. ১, হাদীস নং ২৭৫

www.amarboi.org

বিশেষ করে ব্যভিচারের অপবাদে অপমানিত ও কলঙ্কিত না হয়, মান ইজ্জত-সম্মান যেন ধুলায় মিশে না যায়, সেজন্য ইসলামে অত্যন্ত কঠোর বিধান রাখা হয়েছে। অপবাদ আরোপকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা, আজীবন কোন কাজে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া এবং ফাসিক বা পাপাচারী বলে সাব্যস্ত হওয়ার মত তিনটি কঠিন শাস্তি প্রয়োগের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী সরলপ্রাণ নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে; অতপর স্বচক্ষে দেখেছে এমন চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে, কখনও তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না এবং এরাই পাপাচারী-নাফরমান।'[৪২৮] তিনি আরও বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী নিরিহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত-ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।'[৪২৯]

এমনিভাবে কোন স্বামী নিজের স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলেও তাকে এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে দোষী না হলে শপথের মাধ্যমে সে শাস্তি থেকে রেহায় পেয়ে যায়। কিন্তু স্বামী এ স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় ঘর বাঁধার আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তিরা চারবার শপথ করে এভাবে সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ পড়বে। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, যদি সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে।'[৪৩০] এভাবে স্বামী-স্ত্রীর শপথ করাকে

---

৪২৮. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৪

৪২৯. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ২৩

৪৩০. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৬-৯

www.amarboi.org

পরিভাষায় লি'আন বলা হয়। লি'আনের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ চিরদিনের জন্য ঘটে যায়। তাদের জন্য পুনঃবিবাহের মাধ্যমে কখনই একত্রিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। মহানবী (স.) নিজেও এমন দুই ব্যক্তির মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।[৪৩১] স্ত্রীর মান-সম্মান সুরক্ষার জন্য এর চেয়ে অধিক কার্যকর ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্ম-দর্শন বা আইনে খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বামীর উদাসীন ও ব্যভিচারী জীবন যাপন

অন্যদিকে মদ, জুয়া ও পর-নারীতে মত্ত থেকে উদাসীন জীবন যাপনকারী পুরুষের স্ত্রী সর্বদাই এক রকম মনোজ্বালায় দগ্ধ হয়। সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বহু কর্মকর্তা-কর্মচারী এমন রয়েছে, যাদের স্ত্রীরা সুখী নয়। কারণ স্বামীর চারিত্রিক অধঃপতন হলে, পর-নারীর সাথে অশোভন আচরণ করলে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুললে, নিজের স্ত্রীকে রেখে অন্য নারীতে মত্ত থাকলে, নেশায় বিভোর থাকলে কোন স্ত্রীই শান্তিতে থাকতে পারে না। তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি লেগেই থাকে। প্রচুর টাকা-পয়সা, আরাম-আয়েশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, গাড়ি-বাড়ি থাকার পরও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় দেখা যায়, তাদের কেউ কেউ সুখী নয়। নেশাগ্রস্ত স্বামীর হাতে কখনও কখনও স্ত্রীকে মারও খেতে হয়।

ইসলামে নেশা সৃষ্টিকারী সবকিছুই হারাম। মদ, জুয়া, লটারী সবই হারাম। কারণ এর মাধ্যমে পারস্পরিক শত্রুতা, অশান্তি ও হিংসা-বিদ্বেষের বিস্তার ঘটায়। এগুলো পারিবারিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও অশান্তির অন্যতম কারণ। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ ইসলাম রাখেনি। প্রত্যেক নারী-পুরুষকে নিজ নিজ দৃষ্টিকে নত ও সংযত রাখতে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন পুরুষ গাইরে মুহার্‌রামাত মেয়ের প্রতি এবং কোন নারী গাইরে

---

৪৩১. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০১

www.amarboi.org

মুহাররাম পুরুষের প্রতি বার বার তাকাতে বা দেখতে নিষেধ করা হয়েছে। কারোর পরিচিতি জানার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজনে একবার তাকানোকেই ইসলামী বিধানে যথেষ্ট বলা হয়েছে।

অপরিচিত নারী-পুরুষের কথা-বার্তা কেমন হবে, তার বিধান দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে পর-পুরুষের সাথে কথা-বার্তায় কোমল ও আকর্ষণীয় হবে না, তাহলে সেই ব্যক্তি যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে (তোমার প্রতি) লালসা-কুবাসনা করবে; বরং তোমরা তাদের সাথে ন্যায় সঙ্গত কথা বল।[৪৩২] ভিন নারী-পুরুষের লেন-দেনের পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতির উপকারিতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, 'তোমরা তাদের (মহানবী স.-এর পত্নীদের) কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[৪৩৩] মহানবী (স.) এর পরিবার বিশ্বের সকল পরিবারের জন্য আদর্শ।[৪৩৪] ইসলামের এই মৌলিক ও অমোঘ বিধান মেনে চলার পরও যদি কারো মনে কাউকে দেখে কোনরূপ ইচ্ছা জেগে ওঠে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তা পূর্ণ করে নেয়। এতে তার মনের কুচিন্তা মিলিয়ে যাবে।

বৈধসীমা ছাড়িয়ে নিষিদ্ধ পথে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আর তা হাতে-নাতে ধরা পড়লে অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য ১০০টি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য রজমের মত কঠিন শাস্তি ইসলামে নির্ধারিত রয়েছে। তাছাড়া পুরুষের ওপর অসম্ভব কিছু শর্তারোপ করে একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে; যাতে করে কোন স্ত্রী অবহেলিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত না হয়।[৪৩৫] এভাবে স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা সংরক্ষণে স্বামীকে বাধ্য করা হয়েছে।

---

৪৩২. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৩২

৪৩৩. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৫৩

৪৩৪. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ২১

৪৩৫. বিস্তারিত দ্র. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩, ৪ ঃ ২, ১২৯

www.amarboi.org

স্ত্রীর কাজের মূল্যায়ন না করা

স্ত্রীর কাজের স্বীকৃতি না দেয়া বা অবমূল্যায়ন করা তার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে থাকে। এমন অনেক স্বামী বা শ্বশুরালয়ের ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা গৃহবধূর কোন কাজেরই মূল্যায়ন করে না। তারা স্ত্রীকে অবলা-অপদার্থ বলেই জ্ঞান করে থাকে। বস্তুত ঘর-সংসারের হাজারো রকমের কাজ করে থাকে স্ত্রীরা। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, ত্রিশ বছরের সংসার জীবনে একজন স্ত্রীকে ৩২ হাজার ৮ শত ৫০ বার শুধু তিন বেলা খাবারের আয়োজন করতে হয়। গোটা পরিবারের ঘর-গৃহাস্থলির পুরো কাজের দায়িত্বই স্ত্রী পালন করে থাকে। ছেলে-মেয়ের লালন-পালন, প্রাথমিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মূল কাজটিও তাকেই করতে হয়। স্বামীর প্রতি তার যে কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে তাও সে যথাযথ পালন করে।

স্ত্রী হচ্ছে ঘরের রাণী। মহানবী (স.) বলেন, 'স্ত্রী তার ঘরের সংরক্ষক।[৪৩৬] কাজেই স্ত্রীর কাজকে খাটো করে দেখা বা তাচ্ছিল্য করা অন্যায়। আল্লাহ্র কাছে নারী-পুরুষ যে কারোর কাজই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও স্বীকৃত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমলই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক।[৪৩৭] সর্বোপরি গর্ভে সন্তান ধারণ, প্রসব ও দুগ্ধদানের পরিশ্রমের কথা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই তার কাজের স্বীকৃতি দেয়া যে অপরিহার্য তা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব না দেয়া

অনেক পরিবারে স্ত্রীর নিজের ব্যাপারে, ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে বা সংসারের কোন বিষয়ে তার মতামতের কোন তোয়াক্কাই করা হয় না। ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে স্ত্রীকে অবমূল্যায়নের ফলেই এটি ঘটে। স্ত্রী যে ব্যক্তি হিসাবে স্বাধীন, তার যে চাওয়া-পাওয়া, বক্তব্য ও মতামত থাকতে পারে এমনটি অনেক স্বামী বা শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়রা মনে রাখেন না বা রাখতে

---

৪৩৬. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২

৪৩৭. আল-কুর'আন, ৩ : ১৯৫

www.amarboi.org

চান না। এটি মোটেও ঠিক নয়। স্ত্রী স্বামীর মালিকানাধীন দাসী নয় যে, কোন ব্যাপারে তার কোন মতামত বা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না; বরং স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন।[৪৩৮] যে কোন ব্যাপারে তার পছন্দ-অপছন্দ ও মতামতের গুরুত্ব দেয়া ইসলামী বিধানে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যদি পিতা-মাতা নিজেদের পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও মতামতের ভিত্তিতে দুধ ছাড়িয়ে দিতে চায় তবে ছাড়িয়ে দিতে পারবে। এতে তাদের কোন দোষ হবে না।'[৪৩৯] এমনকি মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে জোরপূর্বক বাধ্য করতে পারবে না; বরং স্ত্রীর সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে বিকল্প পথ অনুসরণে শিশুর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর ভালভাবে পরামর্শ করবে। আর যদি তোমরা পরস্পর জেদ ধর-একমত হতে না পার, তবে তাকে-বাচ্চাকে অন্য নারী স্তন্য দান করবে।'[৪৪০]

এমনিভাবে সন্তানাদির বিয়ে-শাদীর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্ত্রীর মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহানবী (স.) বলেন, 'মেয়েদের বিয়ে-শাদী এবং অন্যান্য ব্যাপারে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর, তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নাও।'[৪৪১] কারণ মেয়েদের ব্যাপারে মায়েরাই বেশি ওয়াকিফহাল হয়ে থাকেন। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে এটি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, মতামত দিতে পারে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন যে কোন বিষয়ে স্ত্রীর মতামত যথার্থরূপে মূল্যায়ন করা জরুরী। তাই স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব না দেয়া তার প্রতি অবিচার করারই শামিল।

---

৪৩৮. আল-কুর'আন, ৯ ঃ ৭১

৪৩৯. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩৩

৪৪০. আল-কুর'আন, ৬৫ ঃ ৬

৪৪১. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৫

www.amarboi.org

সন্তানের ব্যাপারাদি নিয়ে স্ত্রীকে জ্বালাতন করা

প্রত্যেক বাবা মায়ের কাছে সন্তান হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। হৃদয় নিংড়ানো আদর-যত্ন দিয়ে সন্তানকে মানুষ করার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত থাকে না। এক্ষেত্রে বাবার চেয়ে মা-ই বেশি কষ্ট করে থাকেন। তাই স্বামী বা শ্বশুরালয়ের কারো কর্তৃক সন্তানের মা অপমানিত হওয়া, নির্যাতিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইসলামে জায়েয নেই। এমনিভাবে বাবাকেও সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত বা বিরক্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও (বাবাকেও) তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখিন করা যাবে না।[৪৪২] সাধারণত সন্তানের খাওয়া-পরা, সেবা-যত্ন, লেখা-পড়া, সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা, বিশেষ করে সন্তান বড় হয়ে সমাজ গর্হিত কোন কাজ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন সন্তানের বাবা একচেটিয়া তার মাকেই এজন্য দায়ী করতে থাকে। এমনকি শুধু কন্যা সন্তান হওয়া বা একেবারে সন্তান না হওয়ার জন্যেও একচেটিয়া স্ত্রীকে দায়ী করা এবং এজন্য তাকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করা হয়। অথচ বিষয়টির ওপর স্ত্রী বা স্বামীর কোনই হাত নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।[৪৪৩]

এজন্য সন্তানের মাকে হুমকি-ধমকি, কটুবাক্য, গালাগাল এমনকি মার-ধর পর্যন্ত খেতে দেখা যায়। এটি মোটেও ঠিক নয়। সন্তানের জন্য পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে বেশি দরদী কেউ হতে পারে না। মায়ের চেয়ে বেশি কষ্টও কেউ করতে পারে না। কারণ তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, কষ্ট সহ্য করে প্রসব করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর বা আড়াই বছর সময় লেগেছে।[৪৪৪] সুতরাং সন্তানের বিষয় নিয়ে নিজের

---

৪৪২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৩

[৪৪৩]. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র কন্যা মিলিয়ে দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ ক্ষমতাশীল।' (আল-কুর'আন, ৪২ : ৪৯-৫০)

৪৪৪. আল-কুর'আন, ৩১ ঃ ১৪, ৪৬ ঃ ১৫

www.amarboi.org

স্ত্রীকে গালমন্দ করা বা যন্ত্রণা দেয়া মানসিক নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়। দাম্পত্য জীবনের শান্তির জন্য ইসলামের এ বিধানটি মনে রাখা খুব জরুরী। কোনভাবেই সন্তান যেন তাদের নিজেদের মধ্যে কোন অশান্তি সৃষ্টির কারণ না হয়।

ব্যক্তিগত জীবন থেকে বঞ্চিত রাখা

প্রত্যেক মানুষের নিজস্বতা রক্ষা করে চলার অধিকার আছে। স্ত্রী হিসেবে স্বামী নিয়ে নিজের প্রাইভেসি রক্ষা করে চলতে না দেয়া তার প্রতি এক ধরনের মানসিক নির্যাতন। স্ত্রীর মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কেউ কেউ স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়াকে নিজের দায়িত্ব মনে করে না। স্ত্রীকে বাবা-মা, ভাই-বোন ও আপনজনদের সাথে রাখতেই বেশি পছন্দ করে। অথচ শরী'আতের নির্দেশ হল, স্ত্রী যদি সবার সাথে মিলে-মিশে থাকতে সম্মত হয়, তাহলে তা ভাল। আর যদি এক সঙ্গে থাকতে রাজী না হয়, তবে তাকে পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব।

স্বামী যদি আকার-ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট বুঝতে পারে যে, স্ত্রী পৃথক থাকতে চায়, কিন্তু মুখে ব্যক্ত করতে পারছে না, তাহলেও তাকে সবার সাথে একসঙ্গে রাখা জায়েয হবে না। কারণ বৈবাহিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা অর্জন। আর একটি পৃথক ও নিরাপদ বাসস্থান ছাড়া লক্ষ্য অর্জন কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে নিরাপদ অবস্থানের জায়গায় পরিণত করেছেন।'[৪৪৫] এ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, যদি কারোর আলাদা বাসস্থান না থাকে। সুতরাং স্ত্রীর মনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এমন একটি বাসস্থান থাকতে হবে যেখানে অনুমতি ছাড়া বিশেষ করে তিনটি সময়ে বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, তারাও যেন তিনটি সময়ে

---

৪৪৫. আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ৮০

www.amarboi.org

তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে-ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা কাপড়-চোপড় রেখে বিশ্রাম নাও এবং এশার নামাযের পরে। এ তিন সময় তোমাদের নির্বিঘ্নে বিশ্রাম নেয়ার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের এবং তাদের জন্য যাতায়াতে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধানসমূহ বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ।'[৪৪৬]

স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্তত পক্ষে মূল ঘরের একটি রুম সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে দেয়া জরুরী। এতে সে স্বাধীনভাবে যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে পারবে এবং স্বামীর সাথে স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা, ওঠা-বসা ও কথা-বার্তা বলতে পারবে। কেউ কেউ স্ত্রীকে বাবা-মা'র বাধ্যগত ও অধীনস্থ বানিয়ে রেখে এটাকে নিজের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। অথচ এ কারণে স্ত্রী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্ন করা স্ত্রীর অপরিহার্য দায়িত্ব নয়। স্বেচ্ছায় পালনীয় বিষয় এটি। এর জন্য তাকে জোর করা যাবে না। বাবা-মা'র খেদমত করে সৌভাগ্য লাভ করতে চাইলে নিজে খেদমত করবে। বাবা-মা'র সেবা-যত্ন করা সন্তানের জন্য ফরয-অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই এ দায়িত্ব পালন সন্তান নিজে করবে বা চাকর-চাকরানি রেখে করাবে।[৪৪৭]

ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখা

স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ না থাকলে বা বনিবনা না হলে ন্যায়ানুগ পন্থায় দু'জনের পৃথক হয়ে যাওয়ার বিধান ইসলামে রয়েছে। কিন্তু শুধু নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করার জন্য স্ত্রীকে আটকে রাখা বা ঝুলিয়ে রাখা, মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর কোন খোঁজ খবর না রাখা মারাত্মক অন্যায়। এতে সংসারের অশান্তি বাড়ে বৈ কমে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'এবং তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) নির্যাতন ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটকে

---

৪৪৬. আল-কুর'আন, ২৪ : ৫৮

৪৪৭. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২২

www.amarboi.org

রেখ না। আর যে এমন করবে সে নিজের ওপরই অত্যাচার করল। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানসমূহকে তামাশার বস্তু বানিও না।[৪৪৮] এ আয়াত এও প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে কষ্ট দেবে, যুল্‌ম-পীড়ন করবে পরিণামে তার নিজের জীবনই দুর্বিসহ হয়ে ওঠবে। সে নিজেই কষ্ট পাবে এবং তার পারিবারিক জীবন অশান্তির অনলে জ্বলবে। তার প্রতি যেমন আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জেগে ওঠবে তেমনি জনগণ ও মহিলা সমাজের রুদ্ররোষ ও ঘৃণা তার প্রতি ধেয়ে আসতে থাকবে।

বস্তুত, স্বামীর ঘরে স্ত্রী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের যে সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিধান রয়েছে, তা যথার্থরূপে পালন করা ছাড়া নারী মুক্তি ও পারিবারিক শান্তি সম্ভব নয়। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়েরই মর্যাদা সমান। জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষা করে শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সবারই রয়েছে। কোন কারণেই নারী লাঞ্চিত ও অপমানিত হতে পারে না। নারী নির্যাতন বন্ধ করতে ও পরিবারকে শান্তির নীড় বানাতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের যে ভিত্তি মহান আল্লাহ্‌ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তথা 'মাওয়াদ্দাহ' ও 'রাহমাহ'-হৃদ্যতা-আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা এর বন্ধনে আবদ্ধ থাকা খুবই জরুরী। এ ভিত্তি যত দৃঢ় হবে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীব ততবেশি সুন্দর ও সার্থক হবে।

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে শান্তি, স্থিতি ও মাধুর্য প্রতিষ্ঠায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের করণীয়-পালনীয় ইসলাম নির্দেশিত কতিপয় বিশেষ দিক

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বরণ করা

সবদিক বিবেচনায় রেখে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে দেখে-শুনে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই প্রধান কর্তব্য হচ্ছে একে অপরকে সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করে নেয়া। আর্থ-সামাজিক সব বাধা-ব্যবধানকে পেছনে ফেলে স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে হৃদয়-মন উজাড়

---

৪৪৮. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৩১

www.amarboi.org

করে গ্রহণ করবে-এটাই ইসলামের নির্দেশ। সর্বাত্মক চেষ্টা তদবীরের পর যা ঘটে তা মেনে নেয়াই মানুষের ধর্ম। কারণ, কোন মানুষ পরিপূর্ণ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তার জ্ঞান-বুদ্ধি, স্বভাব-প্রকৃতি, গঠন-আকৃতি, অর্থ-সম্পদ, সামাজিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবধান থাকাটা স্বাভাবিক।[৪৪৯] একে অন্যের পরিপূরক হওয়ার মানসিকতা নিয়ে একে অপরকে সাদরে গ্রহণ করলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সাথে পরম বন্ধুত্বের একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারে। তখন দু'জনের সম্পর্ক এমন পর্বতসম মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে যা আমরণ স্থায়িত্ব লাভ করবে।

এটি একটি স্বর্গীয় সম্পর্ক। এ সম্পর্কের স্থায়িত্ব দিতে উদ্যোগ নিতে হয় দু'জনকেই। মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা, ধৈর্য ও পারস্পরিক বোধগম্যতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যে সম্পর্ক, সেটাই প্রবাহিত হতে থাকে যুগ যুগ ধরে। মনোবিজ্ঞানীরা বিবাহিত জীবন শুরুর প্রথম ক'মাস বা প্রথম বছরটাকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। অভিভাবগণকেও নব দম্পতির প্রতি বিয়ের প্রথম বছরে অধিক যত্নবান হতে ও সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা যায়। কারণ ভবিষ্যতে দু'জনের দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিটাই তৈরি হয় এ সময়টুকুতে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই সাধারণত অপরের কাছ থেকে তার আপনজন ও পরিচিতজনদের স্বভাব-আচরণ খুঁজতে থাকে। স্ত্রী তার বাপ-ভাইদের আদর-সোহাগ, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি গুরুত্ব দান, স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বা আচরণ এবং পুরুষ তার নতুন সংসারে মা-বোনের রান্নার স্বাদ, তাদের ঘর সাজানো, তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি চেনা-জানা বিষয়গুলো খুঁজতে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে নতুন সংসারে পরিবেশের নতুনত্ব সইয়ে নেয়ার মত সময় দু'জনের জন্যই প্রয়োজন।

হৃদয়ের গভীর আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ

নারীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ, হৃদয়ের টান ও

---

৪৪৯. 'প্রত্যেক বিষয়ের ভাণ্ডার (আল্লাহ্‌র) হাতে রয়েছে। আমি তা পরিমিত পরিমাণে (মানুষকে) দিয়ে থাকি। (আল-কুর'আন, ১৫ ঃ ২১) আরও দ্রষ্টব্য, আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ৩০, ৪২ ঃ ১২, ৪৩ ঃ ৩২

www.amarboi.org

গভীর অনুভূতি মানুষের প্রতি মহান স্রষ্টার এক বিশেষ দান-উপহার। পরিণত বয়সে একে অন্যের সান্নিধ্যে আসার এক তীব্র ইচ্ছা ও বাসনা তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে। একজন পুরুষের কাছে নারীর ভালবাসাকেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে।[৪৫০] এতেই সে সর্বাধিক তৃপ্তি ও শান্তি পেয়ে থাকে। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে মানুষ ভীষণ দুর্বল। কুরআনের বাণী, 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে'[৪৫১]-আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম তাউস (রহ.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, পুরুষ যখন মহিলার দিকে তাকায় তখন সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।'[৪৫২] অন্যত্র রয়েছে, 'সে স্ত্রীদের লোভনীয় বিষয়ের ব্যাপারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।'[৪৫৩]

কুর'আন মাজীদে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে 'মাওয়াদ্দাহ ও রাহমাহ' [৪৫৪]-আবেগ-ভালবাসা ও সহানুভূতির বন্ধন বলা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালবাসা জন্মগতভাবেই রয়েছে। একজন মুমিন আল্লাহ্‌কে সর্বাধিক ভালবাসে।[৪৫৫] প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ভালবাসা মুমিন জীবনের প্রধান অবলম্বন। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অধিক ভালবাসা থাকে বলেই একজন মুমিন দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য কাজের মধ্যের তার জন্য নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারে। প্রয়োজনে নিজের সম্পদ ব্যয় এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা থাকলে একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালনে যত্নবান হবে, সব বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাবে।

---

৪৫০. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ১৪

৪৫১. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৮

৪৫২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ, *তুহফাতুল আরুস ওয়া নুযহাতুন নুফুস*, (দিল্লী : মাকতাবা এশা'আতুল ইসলাম, তা. বি.), পৃ. ১৮

৪৫৩. তাফসীর জালালাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৪৫৪. আল-কুর'আন, ৩০ ঃ ২১

৪৫৫. আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ১৬৫, ৯ ঃ ২৪

www.amarboi.org

ভালবাসায় একে অপরের প্রতি উন্মত্ততা[৪৫৬] ও গভীরতা দু'জনকে কেবল কাছেই টানবে। কারণ সত্যিকারের ভালবাসা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। আবু দারদা থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন, কোন কিছুর মহব্বত-ভালবাসা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।[৪৫৭] অর্থাৎ প্রিয় ব্যক্তির কোন ত্রুটিই তখন আর তার চোখে পড়ে না এবং প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে কোন কটূক্তি বা মন্দ কথা শুনলেও সে বিরক্ত হয় না শুনতেই চায় না। হৃদয় যখন ভুলে যায় চোখ তখন দেখেও দেখে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) মহানবী (স.) এর সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী (স.) এর দরবারে এসে বলল যে, আমার স্ত্রী আপন-পর অর্থাৎ মুহাররাম-গাইরে মুহাররাম সব পুরুষের সাথেই অবাধে মিশতে চায়, তাকে যে পেতে চায় তারই সে অনুগত হয়ে রাযী হয়ে যায়; এমতাবস্থায় আমি কি করব?

মহানবী (স.) লোকটিকে বললেন, তুমি তাকে ত্যাগ কর-ছেড়ে দাও। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার প্রতি আমার হৃদয়ের ভালবাসাকে সংবরণ করতে পারব বলেতো মনে হচ্ছে না। (অর্থাৎ আমি তাকে অনেক বেশি ভালবাসি।) তখন মহানবী (স.) তাকে বললেন, তাহ্লে তুমি তাকে নিয়েই জীবন যাপন কর।[৪৫৮] অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীর চাল-চলন ও আচার-আচরণে এটা অনুমান করল যে, তার সাথে কেউ অসদাচরণ করতে চাইলে সে বাধা দিবে না। স্বামীর বক্তব্য শুনে মহানবী (স.) সতর্কতামূলকভাবে তাকে বললেন স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে। পরক্ষণে স্ত্রীর প্রতি লোকটির গভীর ভালবাসা এবং স্ত্রীর পৃথক হওয়াকে মেনে নিতে পারবে না জেনে প্রিয় নবী (স.) তাকে এই স্ত্রী নিয়েই সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার

---

৪৫৬. আল-কুর'আন, ১২ঃ৩০

৪৫৭. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত খ. ২, পৃ. ৪১৮

৪৫৮. এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) আরও বলেন, 'তোমরা প্রেমময়ী, অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম মহিলাদেরকে বিয়ে করবে। কেননা আমি তোমাদের আধিক্য নিয়ে কিয়ামতের দিন গর্ব করব। (সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০)

www.amarboi.org

অনুমতি দেন। কারণ এখানে স্ত্রীর ফাহেশা-অবাধ মেলামেশা, অসদাচরণ বা ব্যভিচারের ব্যাপারটি সন্দিগ্ধ, সংশয়মুক্ত নয়। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা ও হৃদ্যতার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত, প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত।

বিয়ের বন্ধন হচ্ছে গভীর প্রেম ও ভালবাসার বন্ধন। এ বন্ধন শিথিল হলে অন্য হাজারো বন্ধন অনতিবিলম্বে ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এ কারণে পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি এবং একে স্থায়িত্ব ও গভীরতা দানের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। বলা হয়ে থাকে, ইসলামী যুগের প্রথম ভালবাসা ছিল আয়িশা (রা.)-এর প্রতি মহানবী (স.)-এর ভালবাসা। তিনি আয়িশাকে বলতেন, আবু যারা' যেমন উম্মে যারা'র ভালবাসায় মত্ত ছিল, আমিও তোমার জন্য তেমনি। তবে সে উম্মে যারা'কে ত্যাগ করেছিল, আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।[৪৫৯]

মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকা

দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির জন্য দ্বিতীয় ভিত্তিটি হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে মায়া-মমতা, দয়া-অনুকম্পা, করুণা-স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকা। করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের মধ্যে এ বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। দৈনন্দিন জীবনে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে, যেখানে একে অন্যের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শন করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে রহমত বলা হয়। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা এবং শারীরিক-মানসিক শান্তি ও তৃপ্তির জন্য একে অন্যের অনুগ্রহ, মায়া-মমতা ও করুণার মুখাপেক্ষি। এটি এমন এক বিষয় যে, যে ব্যক্তি তা প্রদর্শন করবে না সে অন্যের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করতে পারে না। 'যে অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রহ পায় না।'[৪৬০] তাই উভয়কেই উভয়ের প্রতি অনুগ্রহশীল হতে হবে।

---

৪৫৯. সহীহ্ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৯-৭৮০

৪৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৭

www.amarboi.org

দয়া-মায়া দাম্পত্য জীবনের ভয়-ভীতি, দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তখন একের ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্যের কাছে তুচ্ছ মনে হয়; যেন প্রত্যেকেই অন্যকে রক্ষার জন্য সর্বদা তৎপর থাকে। প্রিয় নবী (স.) যে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতবাসী হবে বলে সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদের এক ব্যক্তি হলেন, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সব মুসলিমের প্রতি যে অনুগ্রহশীল, প্রখর হৃদয়ের-তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন সে ব্যক্তি জান্নাতি। এ ক্ষেত্রে এটাও মনে রাখতে হবে যে, অনুগ্রহ যেন কোন অন্যায়ের উদ্দীপক না হয়। ইচ্ছা করে কেউ অন্যায় করে যাবে আর তার প্রতি করুণা করে তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার নিয়ম ইসলামে নেই। স্নেহ ও করুণা প্রদর্শন মানুষকে মহান করে। মহানবী (স.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোৎকৃষ্ট এবং যে নিজ পরিবারের সঙ্গে স্নেহশীল আচরণ করে।'[৪৬১]

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়া বা কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ সময় মানুষের মধ্যে নিহিত কুপ্রবৃত্তি-পাশবিক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে পারে[৪৬২] এবং মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান[৪৬৩] এ সুযোগে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে।[৪৬৪] এরূপ উত্তপ্ত পরিস্থিতির পিছনে কারণ যা-ই থাকুক না কেন, এর একমাত্র প্রতিকার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা। কারণ যে কোন জটিল পরিস্থিতি প্রশমনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ধৈর্য। যে কোন প্রয়োজনে বা সংকট নিরসনে ধৈর্য ও নামাযের আশ্রয় নিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আদেশ দিয়েছেন। তিনি

---

৪৬১. সুনান ইবন মাজাহ, খ. ১, পৃ. ১৪৩

৪৬২. আল-কুর'আন, ১২ : ৫৩, ৫০ : ১৬, ১১৪ : ৪-৬

৪৬৩. আল-কুর'আন, ১২ : ৫

৪৬৪. আল-কুর'আন, ২ : ১০২

www.amarboi.org

বলেন, 'তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর-শক্তি সঞ্চয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'[৪৬৫]

সবর বা ধৈর্য হচ্ছে সংযম অবলম্বন করা এবং নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারা। এটি খুব সহজ ব্যাপার নয়; অত্যন্ত বড় মনের ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।[৪৬৬] জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেক নারী-পুরুষকে এর অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।[৪৬৭] ধৈর্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে পুরুষকেই ধৈর্য ধারণের তাকীদ করা হয়েছে বেশি। কারোর দায়িত্বে অবহেলা, রোগাক্রান্ত হওয়া, সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, কটু বাক্য শুনা বা অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অল্পতে রেগে যাওয়া, অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং মারাত্মক কিছু ঘটিয়ে ফেলা, প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠা কোন মুসলিম তথা মানুষের কাজ হতে পারে না; বরং এসব ক্ষেত্রে প্রচুর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করাই শ্রেয়।[৪৬৮]

নীতিগতভাবে স্বামী তার স্ত্রীর অভিভাবক সন্দেহ নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অতি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক কোন কারণে তাকে অপছন্দ করবে, তার গঠনাকৃতি, চাল-চলনের খুঁটি-নাটি বিষয়াদি নিয়ে তাকে ঘৃণা করবে, অভিভাবকত্বের নামে অত্যাচার করবে, অবহেলা আর অনাদরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে অথবা তাকে তাড়িয়ে দেবে। স্বামীকে একটি বিষয় খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, কোন নারীই সম্পূর্ণরূপে মন্দ বা অকল্যাণের প্রতিমূর্তি নয়, যেমন নয় কোন পুরুষও। কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলে অনেক ভাল ও মহৎ গুণও তার মধ্যে নিহিত থাকে। যেমন সে খুব ধৈর্যশীল, স্বামীর জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সতত প্রস্তুত, ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম ও ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। হতে পারে তার স্বভাব-অভ্যাস খারাপ। কিন্তু সে দীনদার কিংবা সুন্দরী-রূপসী

---

৪৬৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৫৩

৪৬৬. আল-কুর'আন, ৪২ ঃ ৪৩

৪৬৭. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৩৪

৪৬৮. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ১৮৬

www.amarboi.org

বা নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্বসম্পন্ন বা তার গর্ভের সন্তান দুনিয়া আখিরাতে নামী দামী ব্যক্তিদের একজন হবে ইত্যাদি গুণের অধিকারিণী হয়ে থাকে একজন নারী-স্ত্রী।

এ বিষয়ে মুসলিম পুরুষ অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর, তাহলে এও হতে পারে যে, তোমরা স্ত্রীদের কোন একটি বিষয়কে অপছন্দ করছ, অথচ, আল্লাহ্ তার মধ্যে বহু কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।[৪৬৯] এ কারণে মহানবী (স.) বলেছেন, কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা তার একটি অভ্যাস-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপছন্দ করলে, তার অন্য আরো অভ্যাস-চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা-দক্ষতা দেখে সে (স্বামী) খুশি হওয়ার সুযোগও রয়েছে।[৪৭০] সুতরাং কোন কারণে স্ত্রীর কোন কিছু খারাপ লাগলে তখন অস্থির, চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার অপরাপর ভাল দিকগুলোর উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া এবং সেজন্য ধৈর্য ধরা ও অপেক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য। একই কথা স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে তার স্বামীকে গুছিয়ে ওঠতে সময় দেয়া প্রয়োজন। মানুষ হিসেবে প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কাউকে তার অন্যায়-অপকর্ম ও অবাধ্য আচরণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না, ধর-পাকড় করেন না; বরং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংশোধনের জন্য অবকাশ দিয়ে থাকেন। আর তা না হলে পৃথিবী নিমিষেই লণ্ডভণ্ড ও ধ্বংস হয়ে যেত।[৪৭১] কাজেই পরিবারের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে ও ঝামেলাহীন দাম্পত্য জীবনের নিমিত্তে স্বামী-স্ত্রীর অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়ার কোন বিকল্প নেই। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে শাসন করার অনুমতি রয়েছে, অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার সুযোগ রয়েছে সেসব

---

৪৬৯. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ১৯

৪৭০. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৫

৪৭১. আল-কুর'আন, ১০ ঃ ১১, ১৬ ঃ ৬১

www.amarboi.org

ক্ষেত্রেও ইসলাম ধৈর্যধারণ ও ক্ষমাকেই উৎসাহিত করেছে এবং এহেন সংকটময় জটিল ও কঠিন অবস্থায় ধৈর্যধারণ ও ক্ষমাকে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ কর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪৭২]

ধৈর্য একটি পুণ্যের কাজ। আর পুণ্য মানুষের পাপ-তাপ দূর করে দেয়। ধৈর্যের বিনিময় কখনই বিফলে যায় না।[৪৭৩] কাজেই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদ এতে দূর হয়। ধৈর্যশীলগণ এর বিনিময় অগণিত-অফুরন্তরূপে পেয়ে থাকেন। ধৈর্য কেবল সফলতা আর সফলতাই বয়ে আনে।[৪৭৪] এমনিভাবে স্ত্রীর অনেক দোষ ক্ষমা করে দেয়ার গুণও অর্জন করতে হবে স্বামীকে। স্রষ্টার বিধান এটাই।[৪৭৫] খুটিনাটি বা ছোট-খাট কোন দোষ দেখে ক্ষেপে যাওয়া কোন স্বামী-স্ত্রীর জন্যই উচিত নয়। স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি কথায় কথায় দোষ ধরে, একবার কোন দোষ পাওয়া গেলে তা শক্ত করে ধরে রাখে, কোনদিন তা ভুলে যেতে চায় না, তাহলে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যটুকু শুধু নষ্ট হবে না; এর স্থিতিও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কারণ, যে স্বামী তার স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যার স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরন, তার পক্ষে কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রী-পুত্রদের বিষয়ে মানুষকে যেমন সাবধান থাকতে বলেছেন তেমনি তাদেরকে ক্ষমা করতে ও তাদের প্রতি সহিষ্ণু হতেও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে মুমিনগণ ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর-সতর্ক থাক। তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা করে দাও, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর, ক্ষমা করে দাও, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,

---

৪৭২. আল-কুর'আন, ৪২ ঃ ৪২-৪৩

৪৭৩. আল-কুর'আন, ১১ ঃ ১১৪-১১৫

৪৭৪. আল-কুর'আন, ৩৯ ঃ ১০, ২৩ ঃ ১১১

৪৭৫. আল-কুর'আন, ৪২ ঃ ৩০ ও ৩৪

www.amarboi.org

করুণাময়।'[৪৭৬]এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, পরিবার পরিজনের কেউ শরী'আত বিরোধী কোন কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্য বদ দু'আ করা উচিত নয়।[৪৭৭] হাদীসের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন, স্ত্রীর পীড়ন ও বাড়াবাড়িতে ধৈর্যধারণ করা, তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি বেশি গুরুত্ব না দেয়া এবং স্বামীর অধিকারের পর্যায়ে তার যা কিছু অপরাধ বা পদস্খলন হয় তা ক্ষমা করে দেয়া স্বামীর একান্ত কর্তব্য। তবে আল্লাহ্র হক আদায় না করলে সেখানে ক্ষমা করা যাবে না।[৪৭৮]

বস্তুত, পরিবারের সচ্ছলতা, অভাব-অনটন, সুখ-সমৃদ্ধি, বিপদ-আপদ, আনন্দ উল্লাস, দুশ্চিন্তা, হতাশা, ভাল-মন্দ যে কোন অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই অত্যন্ত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত। আনন্দ-উল্লাসে ও ভোগে আত্মহারা হওয়া যেমন ঠিক নয় তেমনি সংকটে ভেঙ্গে পড়াও উচিত নয়। কারণ, স্রষ্টার চিরন্তন বিধান হচ্ছে, 'পৃথিবীতে এবং তোমাদের (মানুষের) জীবনে ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। এটা এ জন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও সেজন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, সেজন্য আনন্দে ফেটে না পড়।'[৪৭৯]

স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি ও তথ্য সংরক্ষণ

পরিবারের নিরাপত্তা, শালীনতা, ভদ্রতা ও আভিজাত্য বজায় রাখতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের একান্ত নিজস্ব গোপনীয় বিষয়াদি সংরক্ষণ করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে

---

৪৭৬. আল-কুর'আন, ৬৪ ঃ ১৪

৪৭৭. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৮

৪৭৮. 'উমদাতুল কারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৩

৪৭৯. আল-কুর'আন, ৫৭ ঃ ২২-২৩

www.amarboi.org

নেককার স্ত্রীর যে পরিচয় দেয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, 'তারা অদৃশ্য-গোপন বিষয়ের হেফাযতকারী।'[৪৮০] তথ্য সংরক্ষণ ও তার গোপনীয়তা রক্ষা করা একটি দায়বদ্ধতাও বটে। যা সংরক্ষণের দায়িত্ব উভয়ের। যারা এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, তাদের প্রতি সদয় হওয়া বা ক্ষমা করারও কোন সুযোগ থাকে না। কাজেই বন্ধু-বান্ধবীদের আড্ডায়, কোন সভা-সমিতি বা সেমিনারে নির্লজ্জভাবে স্বামীর গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করা কোন স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। এমনিভাবে স্ত্রীর কোন গোপন বিষয় প্রকাশ করা স্বামীর জন্যও বৈধ নয়। হাদীসে এমন স্বামীর চরমভাবে নিন্দা করা হয়েছে যে তার স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করে দেয়। 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে মানুষের মধ্যে মর্যাদায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট-অধম ব্যক্তি হবে সে, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রী তার সাথে মিলিত হয়; অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়াদি প্রকাশ করে দেয়।[৪৮১]

যে ব্যক্তি স্ত্রীর দোষ-ক্রটি যেখানে-সেখানে বলে বেড়ায় বা তার সৌন্দর্যের বিবরণ দিতে থাকে, তার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। সে মানুষের কাছে নির্বোধ, হেয় ও নীচ বলে বিবেচিত হয় এবং আল্লাহ্র কাছেও সে নিকৃষ্টতম হিসাবে গণ্য হবে। মহানবী (স.) এর অপর এক দীর্ঘ হাদীসের অংশেও বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ ও অপকারিতার কথা লক্ষ্য করা যায়। মহানবী (স.) একদা নামায শেষে উপস্থিত পুরুষ সাহাবী ও মহিলা সাহাবীদের পৃথক পৃথকভাবে বললেন, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে নিজের স্ত্রীর কাছে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং নিজেকে আড়াল করে নেয় এবং আল্লাহ্র পর্দায় নিজেকে ঢেকে ফেলে অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ? তারা বললেন হ্যাঁ। মহানবী (স.) বললেন, অতঃপর বের হয়ে এসে লোকদের সাথে বলে বেড়ায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে এই করেছি, এই করেছি, তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে কি ?

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রশ্ন শুনে সব সাহাবীই চুপ থাকলেন। রাবী

---

৪৮০. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৩৪

৪৮১. সহীহ্ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৪

www.amarboi.org

বলেন, অতঃপর মহানবী (স.) মহিলা সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যেও কি এমন কেউ আছে যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা প্রকাশ করে ও অন্যদের বলে দেয় ? এক যুবতী হাঁটুর ওপর ভর করে রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে দেখছিলেন এবং তাঁর কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষরা এমন কথা-বার্তা বলে এবং নারীরাও। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, তোমরা কি জান এরূপ যারা করে তাদের দৃষ্টান্ত কি ? অতঃপর তিনি বললেন, সে যেন একটি শয়তান মেয়ে। রাজপথে সে তার সঙ্গী পুরুষ শয়তানের দেখা পেল আর অমনি পুরুষ শয়তান তাকে ধরে নিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে নিল। আর লোকজন তার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকল।'[৪৮২] তাছাড়া স্ত্রীর নিখুঁত সৌন্দর্য ও গোপন তত্ত্বাদির বিবরণে শ্রোতার মনে লালসা ও কুবাসনার সৃষ্টি হতে পারে, শ্রোতা কোন না কোনভাবে সেই স্বামী বা স্ত্রীর সাথে পরকিয়ায় লিপ্ত হতে পারে। ফলে একটি সুখের সংসার ভেঙ্গে যেতে পারে। তদুপরি দোষ-ত্রুটির বিবরণেও শ্রোতার মনে ঐ দম্পতি সম্বন্ধে ঘৃণা জন্মাতে পারে। তখন সামাজিক উপেক্ষা ও সমালোচনা তাদের বন্ধনকে আস্তে আস্তে দুর্বল করবে, এক পর্যায়ে ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য করবে। তাই এ ধরনের কাজকে অপছন্দনীয়-হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৪৮৩] স্ত্রীর প্রসঙ্গে সাধারণ জনসভায় কথা বলার প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম।

লজ্জা ও শালীনতা বজায় রাখা

লজ্জা ও শালীনতা শুধু নারীর ভূষণ নয়; বরং লজ্জা ও শালীনতা মানুষের ভূষণ। মানুষ হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও লজ্জা ও শালীনতাবোধ থাকা জরুরী। এটি দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধি করে। কুরআন মাজীদে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই লজ্জার আরবী প্রতিশব্দ আল-হায়াউ বা আল-ইসতিহইয়াউ' এর ব্যবহার রয়েছে।[৪৮৪] লজ্জা যেমন মানুষকে অন্যায়,

---

৪৮২. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

৪৮৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৬

৪৮৪. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৫৩, ২৮ ঃ ২৫

www.amarboi.org

অত্যাচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করে তেমনি তা মানুষকে মহৎ, কোমল ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এটি মানব চরিত্রের এক সূক্ষ্ম ও নিপুণ বৈশিষ্ট্য। সযতনে এর লালন ও অনুশীলনে মানুষের ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও শরাফত বেড়ে যায়। আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়।

স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবন ধারার গতি অব্যাহত রাখা, উভয়কে উভয়ের জন্য সুরক্ষিত ও পবিত্র রাখার ক্ষেত্রে লজ্জা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বামীর যদি লজ্জা-শরম থাকে, তবে তার নৈতিক চরিত্রের দুর্গ প্রাকার চিরদিন দুর্ভেদ্যই থাকবে। কারো পক্ষেই তা ভেদ করে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে কালিমা লেপন করা, ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে লজ্জা স্ত্রীকেও নৈতিক চরিত্রের পদস্খলন থেকে রক্ষা করে থাকে। এতে পরিবারে শান্তি ও স্থিতি বিরাজ করে। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, কোন বিষয়ের-বস্তুর অশ্লীলতা-কঠোরতা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে আর কোন বিষয়ের-বস্তুর কোমলতা-লাজুকতা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।[৪৮৫]

ফুলের প্রতি ভালবাসা মানুষের চিরকালের। কারণ এতে কোমলতা ও লাজুকতা আছে। একটি বস্তুকে (ফুলকে) যদি কোমলতার গুণ এতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত, আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় করে তুলতে পারে, সেখানে কোন মানুষের মধ্যে এ গুণ পুরো মাত্রায় থাকলে অবশ্যই সে সম্মানীয় ও ভালবাসার মানুষে পরিণত হবে। লজ্জা এমনই এক গুণ যা মানুষের জন্য কল্যাণ আর কল্যাণই বয়ে আনে। কারণ, এটি মানুষকে সর্বপ্রকার গর্হিত ও মানবতা বিরোধী কাজ পরিহার করতে এবং তা থেকে পুরো মাত্রায় বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এ জন্যই লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[৪৮৬]

স্বামী-স্ত্রীকে নির্লজ্জ হওয়ার জন্য শয়তান সবসময় প্ররোচিত করতে থাকে; যেমন করেছিল জগতের প্রথম দম্পতি হযরত আদম (আ.) ও বিবি

---

৪৮৫. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৪

৪৮৬. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০৩

www.amarboi.org

হাওয়াকে।'[৪৮৭] কারণ, কোন দম্পতিকে পশুর মত নির্লজ্জ বানিয়ে দিতে পারলে তাদের পারিবারিক অশান্তি ও বিপর্যয়ের জন্য শয়তানের আর কোন কাজ করতে হয় না। তারা নিজেরাই তখন বেপরোয়া হয়ে নানারকম অসামাজিক কাজে জড়িয়ে যায়। মহানবী (স.) বলেন, 'লজ্জাই যদি তোমার না থাকল, তাহলে ন্যায়-অন্যায় যা ইচ্ছে তাই তুমি করে বসতে পার।'[৪৮৮] ফলে পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা হুমকির সম্মুখিন হয়ে পড়ে। যে কোন অন্যায় ও হীন কাজে লজ্জা পাওয়াকে হাদীসে ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (স.) বলেন, লজ্জা ও ঈমান একে অপরের পরিপূরক। একটির অভাবে অন্যটিও নষ্ট হয়ে যায়।'[৪৮৯] লজ্জাহীন মানুষের পক্ষে যেমন ঈমানের নিরাপত্তা দেয়া সহজ নয় তেমনি তার পক্ষে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখাও কঠিন।

একে অপরের বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জীবন সঙ্গী। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, আর্থিক সংকটে, শারীরিক অসুস্থতায় ও মানসিক যন্ত্রণায় একে অপরের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করা কর্তব্য। অসুস্থ হলে চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থ করা, অভাব-অনটন হলে তা দূর করার চেষ্টা করা, চিন্তিত বা বিষন্ন হলে তা লাঘব করা, বিপদগ্রস্ত বা শোকাহত হলে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখানো উভয়ের প্রতি উভয়ের নৈতিক দায়িত্ব। কোন স্বামী বা স্ত্রী সবচেয়ে বেশি দুঃখ পায় তখন, যখন তার বিপদে তার স্ত্রীকে বা স্বামীকে সহানুভূতিপূর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পায় না। স্ত্রীর বিপদে স্বামীর উদাসীনতা বা পরনারীতে আসক্তি এবং স্বামীর সংকটে স্ত্রীর অবহেলা বা পরপুরুষে আসক্তি পরিবারে যে কোন দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে। সর্বাবস্থায় সহানুভূতি প্রদর্শন করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্

---

৪৮৭. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ২০

৪৮৮. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০৪

৪৮৯. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩২

www.amarboi.org

তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেয়ো না।'[৪৯০]

সহানুভূতি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে তার পরিবার। যে কোন ভয়ানক পরিস্থিতি বা সংকটে মানুষ তার একান্ত আপনজন স্ত্রী বা স্বামীর কাছেই চলে যায়। মহানবী (স.) প্রথম যেদিন ওহী লাভ করেন হেরা গুহায়, সেদিন জিবরাঈল ফেরেশতাকে স্বআকৃতিতে দেখে এবং বারংবার তার আলিঙ্গনে মহানবীর শরীরে কাঁপুনি চলে এসেছিল। তিনি হঠাৎ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত খাদিজা (রা.) এর কাছে চলে আসেন এবং বলতে থাকেন, আমাকে কম্বলাবৃত কর। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেছিলেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর এবং আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দাও, মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢাল।

এরই মধ্যে তিনি বলতে থাকেন, আমি আমার জীবন নাশের আশঙ্কা করছি। একথা শুনে জীবন সঙ্গিনী খাদিজা (রা.) মহানবীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, না কিছুতেই তা হতে পারে না। আল্লাহ্র শপথ, তিনি কখনও আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি অবশ্যই আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, অপরের বোঝা-দায়-দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্ব-অসহায়দের জন্য আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদে-আপদে মানুষকে সাহায্য করেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর এ ধরনের সান্ত্বনার বাণী মহানবী (স.)-এর ভয়-ভীতি ও শঙ্কা অনেকখানি লাঘব করে দেয়। শুধু তাই নয়, খাদিজা (রা.) মহানবী (স.)-এর মনোবল বাড়াতে তাঁকে নিজের চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফল (যিনি পূর্বের আসমানী কিতাবে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন)-এর কাছে নিয়ে যান।[৪৯১] এ ঘটনায় পৃথিবীর সব স্বামী-স্ত্রীর জন্য রয়েছে মহান আদর্শ।

---

৪৯০. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৭৩

৪৯১. মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৫২২, নূরুল ইয়াকীন ফী সায়্যিদিল মুরসালীন, পৃ. ২৬

www.amarboi.org

পারস্পরিক সহযোগিতা

মানুষের প্রধান কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র ইবাদাত করা।[৪৯২] ইসলামের বিধি-নিষেধ, হালাল-হারাম, ফরয, ওয়াজিবসহ যাবতীয় ইবাদত পালনের জন্য স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে উৎসাহ দেয়া, সহযোগিতা করা, প্রস্তুত করা, উভয়েরই নৈতিক দায়িত্ব। এ সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ঐ পুরুষকে রহমত দান করেন, যে রাতের বেলা জেগে ওঠে নামায পড়বে এবং সে তার স্ত্রীকে সেজন্য সজাগ করবে। স্ত্রী ঘুম ছেড়ে ওঠতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা রহমত দান করেন সেই স্ত্রীকে যে রাতের বেলা নিজে নামায আদায় করে এবং স্বামীকেও সেজন্য জাগায়, স্বামী ওঠতে না চাইলে তার মুখেও পানি ছিটিয়ে দেবে।'

'হযরত আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, মহানবী (স.) ঘরে কি করতেন? হযরত আয়িশা (রা.) জবাবে বললেন, তিনি স্বীয় পরিবারের-স্ত্রীর কাজ কর্মে সহায়তায় ব্যস্ত থাকতেন..।'[৪৯৩] গৃহকর্ত্রী হচ্ছে স্ত্রী, গৃহের যাবতীয় কাজ দেখা-শুনা করার মূল দায়িত্ব তার। ছেলে-মেয়ের লালন-পালন, পড়াশুনাসহ গৃহ ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়। তবে এ দায়িত্ব পালনে স্বামীর সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। তার দক্ষ নেতৃত্ব ও পরিচালনায় একটি গৃহের সামগ্রিক শৃঙ্খলা ও শান্তি নির্ভর করে। হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের এক অংশে তিনি বলেন, আমি এমন মেয়েকে বিয়ে করেছি যে তাদের (ঘরের ছেলে-মেয়েদের) ব্যবস্থাপনায় তৎপর থাকবে এবং তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে সঠিকভাবে গড়ে তুলবে।[৪৯৪]

---

৪৯২. আল-কুর'আন, ৫১ ঃ ৫৬

৪৯৩. সহীহ্ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০৮

৪৯৪. বুলুগুল আমানী, খ. ১৫, পৃ, ১৬১

www.amarboi.org

স্বামী-স্ত্রীর এ সহযোগিতা অবশ্যই ইতিবাচক, কল্যাণকর ও নৈতিক মূল্যবোধকে অব্যাহত রাখার নিমিত্তেই হতে হবে। কোন অন্যায়-অপকর্ম, অশ্লীলতা, পাপের কাজ বা সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না। পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ও মূলনীতি বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়া অর্জনে একে অপরকে সহযোগিতা কর আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনে কেউ কাউকে আশ্রয়-প্রশ্রয় বা সহযোগিতা কর না।'[৪৯৫]

পারস্পরিক উপহার বিনিময়

সম্পর্কের গভীরতা ও নতুনত্ব সৃষ্টির জন্য উপহার বিনিময়ের রীতি সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। কাছে টানার এটি একটি কার্যকর উপায়। স্বামীর উচিত, মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে চিত্তাকর্ষক কিছু সামগ্রী উপহার দেয়া। স্ত্রীরও তাই করা উচিত। উপহার পেলে স্বভাবতই মানুষ আনন্দিত হয়। মধুর যেমন মাধুর্য আছে, তেমনি উপহারের আছে প্রেম-ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টির যাদুকরী ক্ষমতা। উপহার একজনের হৃদয়ে অন্যজনের জন্য স্নেহ-ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। দু'জনকে আপন করে দেয় এবং ভুল বুঝাবুঝি, স্বার্থপরতা, কৃপণতা ও মনোমালিন্য দূর করে। মহানবী (স.) বলেন, 'তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর। এতে তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সৃষ্টি হবে, আন্তরিকতা বাড়বে এবং তোমাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, সংকীর্ণতা বিলীন হয়ে যাবে।[৪৯৬]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা পরস্পরে হাদিয়া-উপঢৌকন বিনিময় করবে। কেননা, হাদিয়া-উপঢৌকন মনের কষ্ট-ক্লেদ দূর করে দেয়।'[৪৯৭] এর কারণ সুস্পষ্ট। প্রত্যেক মানুষের মনেই কিছু পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

---

৪৯৫. আল-কুর'আন, ৫ : ২

৪৯৬. মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৪০৩

৪৯৭. জামে' তিরমিযী, প্রাগুক্ত,

www.amarboi.org

বিদ্যমান রয়েছে।'[৪৯৮] কাজেই যখন কেউ কারো কাছ থেকে উপহার হিসাবে কিছু লাভ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে তার প্রতি আবেগে-আনন্দে ঝুঁকে পড়ে, আকৃষ্ট হয় এবং উপহারদাতার মনও খুশিতে ভরে ওঠে। বছরের যে কোন দিনে যে কোন সময় বিশেষ করে যে কোন উৎসবে-আনন্দে উপহার আদান-প্রদান করা যেতে পারে। উপহার হিসেবে স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে কিছু দিলে তা আর ফেরত নেয়া যায় না।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

কৃতজ্ঞতার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে শোকর। এর অর্থ হচ্ছে, The idea of appreciation, recognition, gratitude as shown in deeds of goodness and righteousness.[৪৯৯] কারো সন্তুষ্টি লাভের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে তার গুণের বা কাজের প্রশংসা করা, মূল্যায়ন করা, স্বীকৃতি দেয়া এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে, স্বীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, উপকার করে, বেঁচে থাকার উপকরণাদি যোগান দেয়, সে স্বভাবতই এটা চাইবে যে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক।[৫০০] পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেন, তা সাধারণত স্বতঃস্ফূর্ততার সাথেই করে থাকেন। তারা পারস্পরিক যে দায়-দায়িত্ব পালন করেন, তা আইনের চেয়ে নীতিবোধের ভিত্তিতেই বেশি করে থাকে। কারণ সাংবিধানিক আইন দাম্পত্য জীবনে খুব একটা কার্যকর নয়। তাই এক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি কথায়, কাজে ও আচরণে যত বেশি কৃতজ্ঞতাবোধ পরিলক্ষিত হবে, উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে যাবে। স্রষ্টার বিধান এটাই যে, কেউ তাঁর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেন।[৫০১]

---

৪৯৮. আল-কুর'আন, ৪ : ১২৮

৪৯৯. A Yusuf Ali, The Glorious Quran, Ibid. P. ৬২০

৫০০. আল-কুর'আন, ৩৯ : ৭

৫০১. আল-কুর'আন, ৭ : ১৪

www.amarboi.org

সুতরাং স্বামীকে উৎফুল্ল রাখতে, তার আন্তরিকতা ও ভালবাসায় সিক্ত হতে স্ত্রীকে অবশ্যই তার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী। কোন স্ত্রীই যেন স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহানবী (স.) বলেন, আল্লাহ্ আ'আলা এমন স্ত্রীর প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না, যে তার স্বামীর গুণাবলী বা ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয় না-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; অথচ সে স্বামী ছাড়া চলতেও পারে না।[৫০২] এমনিভাবে স্বামীর উচিত, স্ত্রীর বিনয় ও গৃহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন রকম হীনতা বা লজ্জার কিছু নেই। এতে কেবল ভদ্রতা ও শালীনতাই প্রকাশ পায়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ব্যক্তি তা সে স্ত্রী কিংবা স্বামী যে-ই হোক না কেন এর দ্বারা সে নিজেই বেশি উপকৃত হয়। কারণ, 'যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যই তা করে থাকে।'[৫০৩]

স্বামীর অর্থ-সম্পদে স্ত্রী-পরিজনের এবং স্ত্রীর অর্থ-সম্পদে স্বামীর অধিকারের যথার্থ ব্যবহার

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পৃথক পৃথক অর্থ-সম্পদ থাকতে পারে। আর্থিকভাবে উভয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। স্ত্রীর যে কোন বৈধ পেশা অবলম্বনে অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু স্বীয় উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করতে বা অন্য কারো দায়িত্ব বহন করতে তাকে অর্থ-সম্পদ উপার্জনে বাধ্য করা হয়নি। পুরুষের জন্য স্বীয় উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা এবং পরিবার-পরিজনের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করাকে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। নিজের বা পরিবারের আর্থিক দায়ভার বহন থেকে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা হয়েছে। তাহলে স্ত্রী-পরিজন কি আর্থিকভাবে নিঃস্ব, জীবনোপকরণের জন্য কারোর দয়ার পাত্র, তারা কি কারোর ইচ্ছাধীন অসহায় জনগোষ্ঠী? না। তা মোটেই নয়। পরিবারের কর্তাব্যক্তি হিসেবে

---

৫০২. সুনান নাসাঈ, সূত্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ৪, পৃ. ৩০৯

৫০৩. আল-কুর'আন, ২৭ : ৪০

www.amarboi.org

স্বামীর উপার্জনে ও সম্পদে মানসম্পন্ন জীবন যাপনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ প্রয়োজন তা ভোগ-ব্যয় করার শুধু নৈতিক অধিকার নয়, আইনগত অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। স্বামীর বিনা অনুমতিতেই স্ত্রী নিজের এবং সন্তানের প্রয়োজনে তা ভোগ ও ব্যয় করতে পারে, করার অধিকার আছে। সুতরাং স্বামীর সব সম্পদই তার একার নয়। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী-পরিজনের ভোগ-ব্যয় পরিমাণ অর্থ-সম্পদ তার স্ত্রী-সন্তানের। স্বামীর অর্থ-সম্পদে স্ত্রী-সন্তানের এ অধিকারের সঠিক বাস্তবায়ন ও যথার্থ ব্যবহার একটি পরিবারের শান্তি ও স্থিতির জন্য অপরিহার্য।

স্ত্রীর নিজস্ব কোন অর্থ-সম্পদ সংসারের বা স্বামী-সন্তানের কোন কাজে ব্যয় বা ভোগ করতে দেয়া তার (স্ত্রীর) মহানুভবতা বা দয়া ছাড়া কিছু নয়। এ ক্ষেত্রে স্বামীর জোর-জবরদস্তি করার কোন অধিকার নেই। ছলে-বলে কৌশলে যারা এরূপ করতে চায়, তাদের পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। কুর'আন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এরূপ ব্যক্তিদের তিরস্কার করা হয়েছে।[৫০৪] এখানে এটাও লক্ষণীয় যে, স্ত্রী-পরিজনের ব্যয়-ভোগের জন্য অর্থ-সম্পদ না দেয়া বা কার্পণ্য করা যেমন অন্যায় তেমনি স্বামীর সম্পদের অপচয় করা, বিনষ্ট করা, নিজস্ব তহবিলে জমা করা বা আত্মসাৎ করাও সমান অন্যায় বলে বিবেচিত। কাজেই স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সম্পদে এবং স্বামী হিসেবে স্ত্রীর সম্পদে আইনত অধিকারের যথার্থ বাস্তবায়নে উভয়েই খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আইনগত অধিকার বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বা বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকা

স্বামীর অধিকার বা স্ত্রীর অধিকার হিসেবে ইতোমধ্যে যেসব ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে সগুলোতে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি বা অধিকার ও ক্ষমতার অপব্যবহার বৈবাহিক বা পারিবারিক জীবনে অশান্তির কারণ হয়ে ওঠতে পারে। প্রত্যেকেই যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে পরস্পরের

---

৫০৪. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৯, ৪ ঃ ২১ ও ২৯

www.amarboi.org

অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। বিয়ের বন্ধন অটুট রাখার দায়িত্ব যেমন স্বামীর[৫০৫] তেমনি তা ভেঙ্গে ফেলার-তালাক দেয়ার ক্ষমতাও তার হাতেই ন্যস্ত।[৫০৬] এ ক্ষমতার যেন-তেন প্রয়োগ মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেও এ ক্ষমতার প্রয়োগ আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বিষয়।[৫০৭] স্বামী-স্ত্রীতে যত ভুল বুঝাবুঝি ও ঝগড়া-বিবাদই হোক না কেন বিচ্ছেদের পর্যায়ে যেন তা না পৌঁছায় বা স্বামী যেন হুট করে কিছু করে না বসে সেদিকে দু'জনকেই সচেতন থাকতে হবে। বিচ্ছিন্ন অনিবার্য হয়ে গেলেও তা ঠাণ্ডা মাথায় দীর্ঘ তিন মাসে তিনবারে তা কার্যকর করতে বলা হয়েছে।[৫০৮] এমনিভাবে স্ত্রীকেও অযথা খোলা তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ দাবী করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৫০৯]

সম্পদের ভোগ-ব্যয়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার উভয়েরই রয়েছে। তবে তা নষ্ট করা বা অপচয় করা কারোর জন্যই বৈধ নয়। সম্পদের ভোগ-ব্যয়ে বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বনই কাম্য। স্ত্রী-সন্তানের সংশোধন বা শাসনের নামে অত্যাচার করা, লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান, স্ত্রীর সরলতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে ন্যায্য খাওয়া-পরা ও ভোগ-বিলাস থেকে ও পাওনাদি থেকে বঞ্চিত করা, ঠকানো ও প্রতারণা করা হারাম। একে অন্যের ওপর একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাও অন্যায়ের শামিল। ক্ষমতা ও আইন-অধিকারের অপব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা এর সঠিক ব্যবহার না কর, তবে পৃথিবীতে ফিৎনা-বিশৃঙ্খলা,

---

৫০৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩৭

৫০৬. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৭, ২৩০-২৩১

৫০৭. মহানবী (স.) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্টতম হালাল হচ্ছে তালাক' (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ২৮৩)

৫০৮. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২২৯

৫০৯. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে বিনা দোষে তালাক চায়, তার জন্য বেহেস্তের ঘ্রাণ হারাম হয়ে যায়। আর যে নারী 'খোলা'কে খেলা মনে করে সে মুনাফিক। (সুনান আবু দাউদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩)

www.amarboi.org

অশান্তি ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।[৫১০] এটি একটি মূলনীতি। তাই বৈধ সীমার যে কোন বিষয়ে ইসলামী আইন-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা

ইসলামী বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে প্রত্যেক মানুষের করণীয়-পালনীয় বিষয়গুলোর প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধিকারের দাবী তুলে তা আদায়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি। একজন মানুষ কি কি অধিকার ভোগ করবে তা না বলে একজন মানুষ কি কি দায়িত্ব পালন করবে ইসলামী বিধানে তারই নিখুঁত বিবরণ রয়েছে। ইসলাম স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে, তুমি স্ত্রীর মোহরানা দিয়ে দাও। তুমি যা খাও তাকে তা খাওয়াও, তুমি যা পর তাকে তা পরাও, তার সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না, তাকে গালমন্দ কর না, তাকে কষ্ট দিও না, তার কোন ক্ষতি কর না ইত্যাদি। বরং তাকে নিয়ে সুন্দরভাবে জীবন যাপন কর।

আবার স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হল, তুমি স্বামীর অনুগত থাক, নিজের সতীতের হেফাযত কর, অযথা বাইরে যেয়ো না, স্বামীর সম্পদ বিনষ্ট কর না ইত্যাদি। এতে একটি বিষয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম প্রত্যেককে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতি আদেশ-উপদেশ দিয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম (উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি) নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে। পরিবারের কর্তা ব্যক্তি দায়িত্বশীল, সে স্বীয় কর্তৃত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে এবং স্ত্রীও তার স্বামী, সন্তান ও সংসারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব

---

৫১০. আল-কুর'আন, ৮ : ৭৩

www.amarboi.org

সম্পর্কে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।'[৫১১] ইসলামের এ নীতি বাস্তবায়িত হলে বিনা তাগিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায়ে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন বা আদৌ সচেতন নয়। ফলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা লেগেই আছে। পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে যদি ইসলামের এ সুমহান নীতির বাস্তবায়ন করা যায়, তবে অবশ্যই শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকবে।

পরামর্শ গ্রহণ

পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যদি স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়, তবে কোন কারণে বিষয়টি নেতিবাচক হলেও কেউ কাউকে দোষারোপ করার সুযোগ থাকে না। এককভাবে করলে তাকে অভিযুক্ত করার একটি সুযোগ থেকে যায়। পরামর্শ দু'জনের মধ্যে সমঝোতা, আস্থা-বিশ্বাস, দৃঢ়তা, ভালবাসা ও নির্ভরশীলতা বাড়ায়। পরামর্শভিত্তিক কাজ সুন্দর হয়, ভাল হয়। এতে কাউকে অভিযুক্ত বা লজ্জিত হতে হয় না। এ কারণেই ইসলামী বিধানে গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সন্তানকে কতদিন দুধ পান করানো হবে তা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে।[৫১২] কোন ব্যাপারে দু'জন একমত হতে না পারলে, সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। জোর করে নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর যদি তোমরা পরস্পর জেদ ধর, একমত হতে না পার, তবে তাকে (বাচ্চাকে) অন্য নারীর দুধ পান করাবে (এজন্য বাচ্চার মাকে জবরদস্তি করা যাবে না)।[৫১৩]

---

৫১১. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৩

৫১২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৩৩

৫১৩. আল-কুর'আন, ৬৫ ঃ ৬

www.amarboi.org

এমনিভাবে সন্তানের বিয়ে-শাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্ত্রীর মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হাদীসে নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমরা মেয়ের বিয়ে-শাদী বা অন্য যে কোন ব্যাপারে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর। তাদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নাও। কারণ সন্তানের ব্যাপারে মায়েরাই বেশি দরদী ও ওয়াকিফহাল হয়ে থাকে।[৫১৪]

আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়েও স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। মহানবী (স.)এর জীবনে এরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের পর মহানবী (স.) সাহাবীগণকে এখানেই কুরবানী করে এহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত মক্কা গমন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত বিমর্ষ ও হতাশাগ্রস্ত ছিলেন বিধায় সাহাবীগণের মধ্যে মহানবী (স.) এর এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল না। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিস্মিত হন। তখন তিনি তাবুর ভিতরে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর নিকট সবকথা খুলে বললেন এবং এ মুহূর্তে কি করা যায় তার পরামর্শ চাইলেন।

উম্মে সালমা (রা.) সবকথা শুনে সাহাবীগণের এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান, তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সেকাজ করতে দেখে সাহাবীগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন এবং আপনি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করতে শুরু করবেন।[৫১৫] এ কঠিন পরিস্থিতিতে হযরত উম্মে সালমার পরামর্শ অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছিল। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহর চেয়ে অধিক পরামর্শ গ্রহণকারী আর কাউকে দেখিনি।'[৫১৬] এমনিভাবে স্বামীরা যদি

---

৫১৪. সুনান আবু দাউদ, পৃ. ২৮৫

৫১৫. ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, মহানবীর (সা.) জীবন চরিত, অনুবাদ : মওলানা আবদুল আউয়াল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১/১৪২২, পৃ. ৪৯১

৫১৬. ইবনুল জাওযী, *আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তফা*, লাহুর, ১৯৭৭ খ্রী. খ. ২, পৃ. ২৬৭

www.amarboi.org

তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে কোন কল্যাণকর কাজের বিষয়ে পরামর্শ নেয় তবে অবশ্যই তা পরিবারের জন্য সুফল বয়ে আনবে। আর স্ত্রীকেও তার সব কাজ স্বামীর সাথে পরামর্শ করেই করা বাঞ্ছনীয়।

জিদ ও হটকারিতা পরিহার

জিদ ও হঠকারিতা একটি বদ অভ্যাস। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই এ থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করতে হবে। কারণ জিদের বশবর্তী হয়ে অতি সামান্য ব্যাপারের যে কেউ আগুনের মত জ্বলে ওঠে এবং যে কোন বিপর্যয় ঘটাতে ক্রটি করে না। আর এতে করে পারস্পরিক সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক হয়ে যায়। তাই জিদ ও হঠকারিতা নয়, সম্পর্ক উন্নয়নে নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করার মানসিকতা পোষণ করতে হবে। অনেক স্বামী বা স্ত্রীকে দেখা যায়, আগে থেকেই কোন না কোন বিষয়ে গোড়া বিশ্বাসী বা অন্ধবিশ্বাসী হয়ে থাকে। প্রিয়জনের নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করতে নারাজ। প্রিয়জন এর স্বপক্ষে যত যুক্তি-প্রমাণই হাজির করুক না কেন, সে কিছুতেই তা শুনতে চায় না। এতে হীন মানসিকতা ফুটে ওঠে এবং সে নতুন নতুন চিন্তাধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকে যায়। এতে পরিস্থিতি জটিল হয় এবং দাম্পত্য জীবনে সংকটের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং কখনই জিদের বশবর্তী হয়ে একে অপরের কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয়কে অগ্রাহ্য করা, সইতে না পারা বা পরিহার করতে না পারা, অপরজনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। মানুষের হঠকারিতা ও জিদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের কাছে প্রভুর পক্ষ থেকে যেকোন নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ সম্পর্কে মোটেও চিন্তাভাবনা করে না।[৫১৭] এ আয়াত থেকে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করা ঠিক নয়। যে কোন বিষয়ে ভাল-মন্দ চিন্তা-ভাবনা করে গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত।

---

৫১৭. আল-কুর'আন, ৬ : ৪

www.amarboi.org

একে অপরের কাছে মনের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা অকপটে বলে ফেলা

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যেসব তুচ্ছ কারণে মাঝে মধ্যে মনোমালিন্য হয় এর একটি হচ্ছে একজনের অব্যক্ত ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কেন অপরজন বোঝে না। ধরা যাক ছুটির দিনে স্ত্রী কোথাও বেড়াতে যেতে চাচ্ছে আর স্বামী ছুটির দিনে ঘরে শুয়ে-বসে ক্রিকেট খেলা দেখে কাটাতে চাচ্ছে এবং ভাল খাবার খেতে চাচ্ছে, অথচ কেউ কাউকে মনের ইচ্ছার কথা স্পষ্ট করে বলেনি। দিন পেরিয়ে রাত। খেতে বসে অব্যক্ত চাহিদা অনুযায়ী টেবিলে খাবার না থাকায় স্বামী রেগে গেল। অন্যদিকে দিনে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার অব্যক্ত ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায় স্ত্রীরও মন খারাপ। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয়ে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল। এখানে লক্ষণীয় যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সঙ্গীর কাছ থেকে কিছু আচরণ প্রত্যাশা করেছিল, অথচ দু'জনের একজনও মুখ ফুটে অপরের কাছে মনের কথাটি বলেনি। উভয়েই আশা করেছে অব্যক্ত ইচ্ছাটি অপরজন বুঝে নেবে।

দাম্পত্য জীবনে অনেক সময় অযথা অভিমানের জন্ম হয় এই অহেতুক প্রত্যাশা থেকে। অন্তর্যামী না হয়ে অন্যের কথা বুঝে নেয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরও অনেক স্বামী-স্ত্রী আশা করে যে, সঙ্গী তার মনের অব্যক্ত ইচ্ছাটি বুঝে নেবে। দাম্পত্য সুখের জন্য এই অসম্ভব আশাটি না করাই ভাল। এই সমস্যার সবচেয়ে সহজ সমাধান হল মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা সঙ্গীর কাছে অকপটে বলে ফেলা। পবিত্র কুরআনের বিধান হচ্ছে, এবং তোমরা সোজা কথা বল, তাহলে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম-আচার আচরণ সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন।[৫১৮]

তাই নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে একে অপরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়াই শ্রেয়। তবে তা হতে হবে সঠিকভাবে,[৫১৯] বিনয়ের

---

৫১৮. আল-কুর'আন, ৩৩ ঃ ৭০-৭১

৫১৯. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৮৩

www.amarboi.org

সাথে;[৫২০] কর্কশ কণ্ঠে নয়। কণ্ঠে যেন সর্বদাই থাকে মাধুর্যের ছোঁয়া,[৫২১] ভাষায় থাকে যেন ভদ্রতা[৫২২] ও হৃদয়স্পর্শীতা।[৫২৩] সে কেন বোঝে না-এই অভিমানটি গানে, কবিতায়, গল্পে যতই রোমান্টিক লাগুক না কেন, বাস্তব জীবনে এটি কেবল জটিলতাই সৃষ্টি করে।

দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে চলা

যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা থাকতে হবে উভয়ের মধ্যে। একে অপরের বিভিন্ন আবেগের মুহূর্তের অভিব্যক্তি খেয়াল করতে হবে। একের কাছে অপরে কি চায় খেয়াল করতে হবে। এটা বাস্তব সত্য যে, প্রতিটি মানুষ জীবনে কখনও না কখনও প্রত্যাখ্যাত হয়। এ অবস্থায় একেবারে নিশ্চুপ থেকে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনাই একজন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে এবং নিজেকে গ্রহণীয় করে তুলবে।

আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে যারা দক্ষ বা প্রভাবশালী তারা সাধারণতঃ কারো সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে না।[৫২৪] দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।[৫২৫] বিতর্কের সময়ও উত্তম পন্থায় বিতর্কে জড়ায়।[৫২৬] রাগ করে, মুখ ভার করে, তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটি করে গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা স্বামী স্ত্রী কারোর জন্যই উচিত নয়। একজনের বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে অপরজন নিজের মান-মর্যাদার অভিমানে ফেটে পড়া কিছুতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। স্বামীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও

---

৫২০. আল-কুর'আন, ২০ ঃ ৪৪

৫২১. আল-কুর'আন, ৩১ ঃ ১৯

৫২২. আল-কুর'আন, ১৭ ঃ ২৩

৫২৩. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৬৩

৫২৪. আল-কুর'আন, ২১ ঃ ৬৩, ৭২

৫২৫. আল-কুর'আন, ২৫ ঃ ৭২

৫২৬. আল-কুর'আন, ১৬ ঃ ১২৫

www.amarboi.org

যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যায়, তবে স্ত্রীর তাই করা উচিত। এমনিভাবে স্বামীও অপরিসীম ধৈর্যসহকারে স্ত্রীর ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করা অপরিহার্য।

পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক না থাকলে পরিবারে স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দেয়ার আশঙ্কা থাকে। আস্থা-বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের আজন্মপ্রবণতা। কারণ বিশ্বাসের সাথে মানুষের নিরাপত্তাবোধের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শিশু যখন মাকে জড়িয়ে ধরে নিরাপত্তাবোধের বিশ্বাস থেকেই সে তা করে। এ বিশ্বাসবোধে যখন চোট লাগে তখন শিশু কাঁদে। পূর্ণবয়স্ক মানুষ কাঁদতে পারে না, সে বিষণ্ন হয়। সেই সাথে তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতিও জন্ম নেয়।

এমনিভাবে বিশ্বাসের পিছনে অতি সূক্ষ্মভাবে হলেও শ্রদ্ধাবোধের অস্তিত্ব থাকে। একে অপরকে আপন ভাববার একটি প্রবণতা কাজ করে। কারও প্রতি যথেষ্ট আস্থা থাকলে তাকে সহজেই অবিশ্বাস করা যায় না। পারিবারিক শান্তির জন্য অপরিহার্য এই উপাদানটির অভাবে পারস্পরিক অশ্রদ্ধা, নিরাপত্তাহীনতা ও মমত্ববোধের অভাব জন্ম নেয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর এভাবে চলতে থাকলে যে কোন মুহূর্তে পারিবারিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

সেজে-গুজে পরিপাটি হয়ে জীবন যাপন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি-পাঠিয়েছি, যে পোশাক তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং সাজ-সজ্জাও (অবতরণ করেছি)।'[৫২৭] তিনি আরও বলেন, 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজ-সজ্জা গ্রহণ কর।'[৫২৮] অর্থাৎ

---

৫২৭. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ২৬

৫২৮. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ৩১

www.amarboi.org

সাধ্যমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পোশাক পরিধান কর। এ দু'টো আয়াতে উত্তম পরিচ্ছন্ন-সুন্দর পোশাক পরা ও সেজে-গুজে থাকার প্রতি ইসলামের বিশেষ তাগিদ ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলায় প্রবাদ আছে, সেজে-গুজে নারী, লেপেপুছে বাড়ি অর্থাৎ মেয়েরা যত সুন্দর করে সাজে তাকে ততবেশি আকর্ষণীয় দেখায়। দাম্পত্য জীবনে প্রত্যেক নারী-পুরুষকেই সাধ্যমত সেজে-গুজে পরিপাটি থাকা উচিত। এটি সুখ-শান্তির এক বড় নেয়ামক শক্তি। বর্তমানে স্ত্রীর অবস্থা হল স্বামীর সামনে সে নোংরা-অপরিচ্ছন্ন সাধারণ কাপড়-চোপড় পরে থাকে। সাজ-গুজের কোন প্রয়োজনীয়তাই সে অনুভব করে না। কখনও বা নিজ গৃহে গৃহপরিচারিকার ন্যায় জামা-কাপড় পরে থাকে। অথচ বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় বা গৃহে বিশেষ কোন অতিথির আগমন ঘটলে সে বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় সেজে আপাদমস্তক সজ্জিত হয়ে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, স্বামী যখন স্ত্রীকে পরিপাটি হয়ে চলতে বলে তখন সে তা করতে চায় না। অথচ স্বামীর চাওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কারণ স্ত্রীর সৌন্দর্য প্রকাশের প্রথম ও প্রধার ব্যক্তিই হচ্ছেন স্বামী।[৫২৯]

এমনিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়াও স্বামীর কর্তব্য। এতে আনন্দের মাত্র বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অপরিচ্ছন্ন মলিন দেহ ও পোশাক নিয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়া স্বামীর একেবারেই অনুচিত। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এ পর্যায়ে একটি নীতি হিসেবে বলেছেন, 'আমি স্ত্রীর জন্য সাজ-সজ্জা করা খুবই পছন্দ করি যেমন পছন্দ করি যে, স্ত্রী আমার জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করুক।'[৫৩০] স্বামী-স্ত্রী হচ্ছে পরস্পরের আমোদ-প্রমোদ,

৫২৯. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩১

৫৩০. ইবন জারীর ও ইবন হাতেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সূত্র-পরিবার ও পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

www.amarboi.org

মনোরঞ্জন ও খেলার শ্রেষ্ঠ সাথী, উপায়-অবলম্বন।[৫৩১] পুরুষের কাছে লোভনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে নারীগণই হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান বিষয়।[৫৩২]

কাজেই আকর্ষণীয় প্রধান সাথী হিসেবে স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসার জন্য স্বামীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকা বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, অতএব পুরুষ তার বিনোদনের সাথীর জন্য সামর্থ্যানুযায়ী যেন সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে। কেননা, স্ত্রী পুরুষের মনোরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক, তার চক্ষুদ্বয়ের পরিপূর্ণ তৃপ্তিদায়ক, মহিলার (স্ত্রীর) সৌন্দর্যাবলীর উত্তম প্রকাশক এবং প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার অধিক স্থায়িত্বদানকারী।[৫৩৩] রূপচর্চা বা সাজ-সজ্জা গ্রহণের অধিক উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে ঐ সময়সমূহ, যখন পুরুষগণ সাধারণতঃ পরিবারের সান্নিধ্যে অবস্থান করে। যে সময়ের উল্লেখ পবিত্র কুরআনে রয়েছে এবং যখন ঘরের আয়া-বোয়া, দারোয়ান ও সন্তান-সন্ততিও অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ বলে ঘোষণা রয়েছে।[৫৩৪]

পরিপাটি ও সেজে-গুজে থাকার প্রতি ইসলামে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। মুয়াবিয়া ইবন ইয়াহইয়া বর্ণনা করেন, একদা হযরত আয়িশা (রা.) এর ঘরে একজন মহিলা প্রবেশ করেন। মহানবী (স.) হযরত আয়িশার কাছে মহিলার পরিচয় জানতে চান। হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, সে ওমুকের স্ত্রী ওমুক। অতঃপর মহানবী (স.) বললেন, আমি অবশ্যই মেয়েদের 'মারহা' এবং 'মালদা' হওয়াকে অপছন্দ করি। 'মারহা' হচ্ছে সেই মেয়ে, যার চোখে সুরমা নেই আর 'মালদা' হচ্ছে যার হাতে মেহেদী রং নেই।[৫৩৫] মুয়ারিয়া ইবন সালামা (রা.) থেকে ইমাম আওযায়ী

---

৫৩১. সহীহ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ, ৭৬০, সুনান আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ২৮০, জামে' তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ১৩০

৫৩২. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ১৪

৫৩৩. আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৫৩৪. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৫৮

৫৩৫. আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

www.amarboi.org

(র.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (স.) একদা সত্তর উর্ধ্বের বয়সের এক মহিলাকে মেহদী রঙ্গে রঞ্জিত নন দেখতে পান এবং বলেন, কোন মহিলার হাত পুরুষের হাতের মত সাজহীন থাকা উচিত নয়। রাবী বলেন, সত্তর উর্ধ্ব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই মহিলা সবসময়ই মেহেদী ব্যবহার করতেন।[৫৩৬] এমনিভাবে আরও বহু বর্ণনা হাদীসের কিতাবসমূহে রয়েছে, যাতে মেয়েদের সাজগুজের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

হাস্য-রসিকতা, বিনোদন ও ভ্রমণ

হিউমার বা রসবোধ একটি বড় গুণ নিজেকে অন্যের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে। কোন বিপজ্জনক বা জটিল পরিস্থিতিতেও হাস্য রসিকতা সহসাই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও তা লালন করার ক্ষেত্রে এটি সবসময়ই ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কাজেই জটিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধের বিকল্প নেই। তবে মনে রাখতে হবে, রসিকতা যেন কারোর কষ্টের কারণ না হয়। তাহলে তা ঠাট্টা-বিদ্রুপে পরিণত হবে যা ইসলামে জায়েয নেই। আবার সবসময় যেন কেউ হাস্য-রসিকতায় লিপ্ত না থাকে, তাহলে তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবে। এতে যেন কোন অসত্য বা প্রতারণার মিশ্রণ না ঘটে। মহানবী (স.) নারী-পুরুষ সবার সাথেই মাঝে-মধ্যে রসিকতা করতেন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মহানবী (স.) এর কাছে একটি বাহন চাইলেন। মহানবী (স.) তাকে বললেন, আমি তোমাকে উটনীর বাচ্চার ওপরে আরোহণ করাচ্ছি। অতঃপর লোকটি বলল, আমি উটনীর বাচ্চা নিয়ে কি করব? মহানবী (স.) বললেন, উটের জন্মতো কেবল উটনীরাই দিয়ে থাকে। হযরত আনাস (রা.) অপর এক হাদীসে বলেন, মহানবী (স.) এক বৃদ্ধাকে বললেন, কোন বৃদ্ধা-বয়স্কা স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধা বললেন, তাদের কি হয়েছে, তারা কেন জান্নাতে যেতে পারবে না? বৃদ্ধা কুর'আন পাঠ করছিল। তখন মহানবী (স.) বৃদ্ধাকে

---

৫৩৬. মুসনাদে আহমদ, খ. ৫, পৃ. ৩৮১

www.amarboi.org

বললেন, তুমি কি কুর'আনে পড়নি 'ইন্না আনশা'নাহুন্না ইনশাআন ফাজা'আলনাহুন্না আবকারান..' অর্থাৎ 'আমি তাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, স্বামী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।।'[৫৩৭]

বিনোদনের জন্য স্বামী-স্ত্রী মিলে কোন প্রতিযোগিতা করা, খেলাধুলায় সময় কাটানো, কোন ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম দেখা, বা কোথাও কোন বৈধ খেলা দেখতে যাওয়া বা কোন পার্কে, বনভোজনে বা আনন্দ ভ্রমনে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো দাম্পত্য মাধুর্যে নতুন মাত্রা যোগ করে দেয়। এতে ক্লান্তি দূর হয় এবং মন প্রফুল্ল থাকে।

রসিকতা শুধু মহানবী (স.)ই করতেন না, তাঁর স্ত্রীগণও সময় সময় রসিকতা করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাবুক যুদ্ধ মতান্তরে হুনাইন যুদ্ধ থেকে আগমন করেন। ঘরে তিনি তাঁর (আয়িশার) খেলনার জিনিসগুলো আলমারী বা তাকে ওঠিয়ে ঢেকে রাখতেন। বাতাসে পর্দার কিনারা খুলে গেলে মহানবী (স.) সেগুলো দেখে ফেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আয়িশা! এগুলো কি? তিনি বললেন, এগুলো আমার মেয়ে পুতুল। মহানবী (স.) এরই মধ্যে একটি ঘোড়াও দেখতে পেলেন; এর মধ্যে পশমী কাপড়ে দু'টি ডানাও রয়েছে। তখন তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এগুলোর মাঝখানে যা দেখতে পাচ্ছি ওটা কি? তিনি বললেন, ঘোড়া। মহানবী (স.) বললেন, ঘোড়ার ওপরে ঐ দু'টো কি? বললেন, দু'টো ডানা। মহানবী (স.) বললেন, ঘোড়ার আবার দু'টো ডানা! আয়িশা (রা.) বললেন, ওহে আপনি কি শুনেননি যে, সুলাইমান (আ.) এর কতগুলো ডানাবিশিষ্ট ঘোড়া ছিল। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন মহানবী (স.) এমনভাবে হাসলেন যে, আমি তাঁর দাতের মাড়ি পর্যন্ত দেখেছি।[৫৩৮]

---

৫৩৭. মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৬

৫৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭

www.amarboi.org

দাম্পত্য জীবনে বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এক ঘেয়ে জীবন কারোর কাছেই ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে কোথাও বেরিয়ে আসা, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়া, বিয়ের অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হওয়া ইত্যাদি জীবনে কিছু সময়ের জন্য হলেও পরিবর্তন আনে। দু'জনে মিলে কোন খেলাধুলায় সময় কাটালেও দোষের কিছু নেই। স্বয়ং নবীর জীবনে এমন ঘটনার নযীর রয়েছে। মহানবী (স.) হযরত আয়িশা (রা.) এর সাথে দু'বার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। প্রথমবার আয়িশা (রা.) বিজয়ী হন এবং দ্বিতীয়বার মহানবী (স.) বিজয়ী হন।[৫৩৯] এক দিনের ঘটনা। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আশুরার দিনে খেলাধুলায় মগ্ন কিছু হাবশী ও অন্যান্য লোকদের শ্রুতিমধুর শব্দ শুনতে পেলাম।

তখন মহানবী (স.) আমাকে বললেন, তাদের খেলা দেখতে কি তোমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে? আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। অতঃপর মহানবী (স.) তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা মহানবী (স.) এর বাড়িতে চলে আসল। মহানবী (স.) ঘরের দরজার দু'দিকে দু'হাত রেখে দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন। আর আমি আমার থুথনি মহানবীর হাতের ওপরে রেখে দাঁড়ালাম। খেলোয়াড়দল খেলতে শুরু করল আর আমি দেখতে থাকলাম। কিছুক্ষণ দেখার পর মহানবী (স.) বললেন, তোমার দেখা শেষ হয়েছে কি? আমি বললাম, দাঁড়ান আর একটু দেখে নেই। এভাবে তিনি আমাকে দু'বার কি তিনবার বললেন, আমিও তাই বললাম। তারপর তিনি বললেন, আয়িশা এবার বোধ হয় তোমার সাধ মিটে গেছে। আমি বললাম, হ্যাঁ, হয়েছে। অতঃপর মহানবী (স.) খেলোয়াড়দের চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন এবং তারা চলে গেল।[৫৪০]

সুতরাং বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে, দু'ঈদের দিনে, নববর্ষের দিনে, আশুরার দিনে, বিজয় দিবসে স্ত্রীকে নিয়ে শরী'আতসম্মত কোন বিশেষ

---

৫৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬

৫৪০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, সূত্র, ইহইয়াউ উলূম আলদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

www.amarboi.org

অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, একটু ঘুরে আসা দোষের তো নয়-ই বরং তা পারিবারিক শান্তির সহায়ক হতে পারে। মহানবী (স.) বলেছেন, 'পূর্ণাঙ্গ মুমিন তারা যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর এবং যারা স্বীয় পরিবারের প্রতি সবচেয়ে বেশী সোহাগী।[৫৪১]

উপসংহার

বৈবাহিক জীবন এক দীর্ঘ জীবন। মরণ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে এ দীর্ঘ সময় দম্পতিকে টিকে থাকতে হয়। দু'জনে মিলে সবসময় ভাল থাকার চেষ্টা করে যেতে হয়। একজন পুরুষ আর একজন মহিলা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মৌলিক উদ্দেশ্যও এটা। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া দু'জনের সাধ্যের সীমাবদ্ধতা, জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতা, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ব্যবধান, দু'টি ভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়ায় দু'জনের কৃষ্টি-কালচার ও সামাজিকতার পার্থক্য দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে একেবারে মিলিয়ে যায় না। তদুপরি কুপ্রবৃত্তি, মানব শয়তান ও জ্বিন শয়তান দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরাতে সবসময় ইন্ধন দিতে থাকে। ফলে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে কখনো দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য, নাজুক পরিস্থিতি ও অশান্তি দেখা দিতে পারে। সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে কোন না কোন সময় প্রত্যেকটি দম্পতিকে এরূপ সমস্যায় পড়তে দেখা যায়।

অধিকাংশ সময় এরূপ মনোমালিন্য ও বিরোধ অল্পসময়ের ব্যবধানে এমনিতেই দূর হয়ে যায়। এর জন্য নিজেদের বা অন্য কারোর কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালবাসাই তা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু কখনো কখনো পরিস্থিতি জটিলতার দিকে মোড় নেয়। আর এটি হয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রী যে কোন একজনের বাড়াবাড়ি, অবাধ্যতা ও নির্যাতনের জন্য অথবা এর জন্য দু'জনই সমভাবে দায়ী হয়ে থাকে। দাম্পত্য বিরোধ যার জন্য বা যে কারণেই হোক না কেন, তা মীমাংসার

---

৫৪১. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। সূত্র, ইহইয়াউ উলূম আলদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

www.amarboi.org

জন্য নিজেদেরকেই উদ্যোগ নিতে হবে। স্ত্রী দায়ী হলে সেক্ষেত্রে স্বামী তা নিষ্পত্তির দায়িত্ব নিবে। আর স্বামী দায়ী হলে স্ত্রী তা দূর করতে এগিয়ে আসবে। আর দু'জনেই দায়ী হলে এরও নিষ্পত্তির দায়িত্ব প্রথমত দুজনের। নিজেরা তা মিটাতে না পারলে উভয়ের পরিবারের আপনজনদের দায়িত্ব হচ্ছে তা মিটমাট করে দেয়া।

স্ত্রীর স্বভাব-আচরণের কারণে সৃষ্ট দাম্পত্য কলহ মীমাংসায় স্বামীকে অত্যন্ত দরদী মন ও কোমল হৃদয় নিয়ে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে তা মীমাংসা করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সাবধানী হতে হবে, যেন সে নিজেই আবার নির্যাতক বা দোষী না হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ভয় মনে রেখে সে তার স্ত্রীর সংশোধনের চেষ্টা করবে। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সবকিছুকে অবলম্বন করে মিলমিশ করে নেবে। স্ত্রীকে কোন কিছু বোঝানোর ক্ষেত্রে কোন রকম ছলচাতুরি, ধূর্তামী, কঠোরতা, ধমক, নিন্দা, গালমন্দ ইত্যাদি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

কর্তাব্যক্তি হিসেবে স্ত্রীর জীবন, সম্পদ ও মান-সম্মান রক্ষা করতে শত্রুর বিরুদ্ধে স্বামী যেমন সম্ভব সব রকম উপায় অবলম্বন করে তেমনি স্ত্রী নিজেও যেন শরী'আত ও সমাজ বিরোধী কোন কাজে জড়িয়ে যেতে না পারে সেদিকেও স্বামীকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্ত্রীর হৃদয়ের কোমল-স্নিগ্ধ ভালবাসা ও করুণার স্পর্শ পেয়ে স্বামী, সংসার-সন্তান সবাই যেন তৃপ্ত ও পূর্ণ হতে পারে সেরকম পরিবেশ স্বামীকেই নিশ্চিত করতে হবে। স্বামীর ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও মহানুভবতা এক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক সুস্থতা ও বিবেক-বিবেচনা বোধকে জাগ্রত করতে পারলে অবশ্যই তার টনক নড়বে এবং সে সংশোধন হয়ে যাবে।

দাম্পত্য কলহের জন্য স্বামী দায়ী হলে স্ত্রীকে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। স্বামীকে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখতে ও সংসারী হতে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করবে। প্রয়োজন হলে নিজের প্রাপ্য অধিকারে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও দ্বন্দ্ব-

www.amarboi.org

কলহের অবসান ঘটাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা অথবা এড়িয়ে চলার আশঙ্কা করে, তবে উভয়ের কারোর কোন অপরাধ হবে না; যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়। আর সমঝোতাই উত্তম। আর সব ব্যক্তি-মানুষেই লোভ-কার্পণ্য বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি তোমরা সুন্দরভাবে জীবন-যাপন কর এবং সংঘাত থেকে মুক্ত থাক, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমরা যা কর সে বিষয়ে খবর রাখেন।' [৫৪২]

দাম্পত্য কলহে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। এতে জটিলতা দূর হওয়ার চেয়ে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি দেখা দেয়। গায়ে পড়ে উপকার করতে আসা লোকটি পুরুষ হলে স্ত্রীর মনে এবং মহিলা হলে স্বামীর মনে সন্দেহ আরও বেড়ে যেতে পারে। হিংসুটে অসৎ মানুষ অন্যের ক্ষতি করার সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। কোন দম্পতির মান-অভিমান ও দ্বন্দ্ব-কলহের সময়কেই তাদের কুমতলব পূরণের উপযুক্ত সময় মনে করে থাকে। তাই এ স্পর্শকাতর সময়েও প্রত্যেক দম্পতিকে খেয়াল রাখতে হবে, মানুষরূপী শয়তান যেন তাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে।

ইসলাম সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে কে কতটুকু আন্তরিক বা সফল তা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে মনোমালিন্য মিটে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হতে দেরি হয় না। এ দায়িত্ববোধ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে বিশেষ করে মনোমালিন্য চলাকালে এ দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা মনে পড়লে উভয়ের মধ্যে যে কোন কঠিন অবস্থায়ও সমঝোতা হওয়া সহজ হয়ে ওঠতে পারে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে গুরু দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছে, তার শতভাগ পালন করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, এটি এমন এক সম্পর্ক যেখানে দেহ-মন, সম্পদ, সম্মান সবই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই নিজ নিজ সীমাবদ্ধতা, অপারগতা ও দুর্বলতার প্রতি

---

৫৪২. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১২৮

www.amarboi.org

ফিরে তাকালে একে অন্যের প্রতি আরও বেশি সহনশীল, দরদী ও দায়িত্বশীল হওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।

তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সবসময়ের বন্ধু, জীবন সাথী। সারাক্ষণ একে অপরের মনোরঞ্জন করা, সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা, একে অপরের আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন করা খুব সহজ কাজ নয়। এজন্য প্রত্যেককেই যথেষ্ট ছাড় দিতে হবে। সঙ্গীর কোন কিছু অপছন্দ হলে বা ঘৃণ্য হলেও দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য রক্ষায় তা দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। সম্ভব না হলে তা অকপটে বরদাশত করতে হবে। সংসারের শান্তির জন্য স্বামীকে বধির এবং স্ত্রীকে অন্ধ হতে হবে। বাইরের রং দেখে কেউ কাউকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করা ঠিক নয়; তার ভিতরের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করতে পারে। এক্ষেত্রে ধৈর্যের কোন বিকল্প নেই। ধৈর্য ধরার পর যে ফল পাওয়া যায়, তা আরও বেশি মধুর ও উপভোগ্য হয়।

■ ■ ■

www.amarboi.org